৫ আগস্ট ২০০৭ সংবাদ প্রতিদিন

রোববার

শ্রাবণসন্ধ্যা

সংবাদ প্রতিদিন-এর সঙ্গে বিনামূল্যে

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

রথযাত্রার শুভক্ষনে শুরু হয়েছে বাম্পার ড্র

প্রথম পুরস্কার :- ৫ টি বহুমূল্য হীরের নেকলেস

দ্বিতীয় , তৃতীয়...

কিনতে থাকুন।

অঞ্জলি জুয়েলার্স™

সবার জন্য

www.anjali.bz

গোলপার্ক ঃ ২৪৪০ ১৭৯২ / ২৪৬০ ০৫৮১ সল্টলেক ঃ বি. ই. ১০১, ২৩২১ ২০৫৭ / ২৭৮৬

সল্টলেক ঃ এইচ. এ. - ৩, ২৩২১ ৮৩১০ / ১১ বেহালা ঃ ২৪৪৫ ৫৭৮৪ / ৮৫ (স্টেট ব্যাঙ্কের পাশে)

শোভাবাজার ঃ মেট্রো স্টেশনের পাশে ২৫৩৩ ৫৮৩২ / ৫৮৩৪

এছাড়া আমাদের আর কোন শো - রুম নেই

theadventure@mail.com

লেটারবক্স ৪

৫ আগস্ট ২০০৭

রোববার

ফার্স্ট পার্সন
ঋতুপর্ণ ঘোষ ৬

ভালো-বাসার বারান্দা
নবনীতা দেবসেন ৮

এবার মল্লাট
শ্রাবণসন্ধ্যা
অতনু চক্রবর্তী ১২

বড়দিদি
বনশ্রী সেনগুপ্ত ২০

সেই সন্ধ্যা
শ্রীকান্ত আচার্য ২৪

রোববারের আড্ডা
মার্ক টুলির সঙ্গে ২৬

বাংলার মুখ
পথের পাঁচালি
জয়া মিত্র ২৮

রোববারের রামপ্রসাদী
আয় মন বেড়াতে যাবি
সুব্রত মুখোপাধ্যায় ৩০

রোববারের মেগা
কলিকাতায় নবকুমার
সমরেশ মজুমদার ৩৪

সেন সলিউশনস
রাইমা সেন ৩৮

রান্নাঘরে রেস্তোরাঁ
ট্যামারিন্ডের দক্ষিণী খিচুড়ি আর
চিকেন কোরি গাস্যি ৪০

টিম রোববার
অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়
অর্পিতা চৌধুরী
তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
নীলাঞ্জনা বসু
প্রসূন চক্রবর্তী
বর্ণিনী মৈত্র চক্রবর্তী
বিপুল গুহ
রিংকা চক্রবর্তী
শান্তনু দে
সন্দীপন মজুমদার
সুপ্রিয় দাস

সৌজন্য
দেবাঞ্জন চক্রবর্তী
ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি
সারেগামা

সম্পাদক ঋতুপর্ণ ঘোষ

প্রতিদিন প্রকাশনী লিমিটেডের পক্ষে সৃঞ্জয় বোস কর্তৃক
বি এল পাব্লিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।

সংবাদ প্রতিদিন এর সঙ্গে বিনামূল্যে

সাত পাকে বাঁধা

কোনওভাবে কয়েকমাস আগে রোববার পত্রিকাটি আমার হাতে এসেছিল। রবিবার আমার ছুটি থাকে না। কিন্তু কাজের শেষে বইটি পড়ে আমি মুগ্ধ। তারপর থেকে ফাঁক পেলেই ভাবি, যিনি বাড়িতে কাগজ দেন, তাঁকে বলে রাখব রবিবার সংবাদ প্রতিদিন দিতে। কিন্তু নানান ব্যস্ততায় ভুলে যাই।
আশ্চর্যজনকভাবে, আমার স্বামী কিন্তু প্রতি রবিবারই আমার জন্য একটি করে রোববার নিয়ে আসেন। যদিও তিনি বাংলা সাহিত্যকে আমার মতো ভালবাসেন না। রোববার পড়তে আমার সবচেয়ে ভাল লাগে কারণ, এর পরতে-পরতে জড়িয়ে আছে পরিপূর্ণ বাঙালিয়ানা। একটি পাতাও এমন নয় যে, না পড়ে বাদ দিয়ে যাব।
রুচিশীলতার দিক থেকে বিচার করলে রোববার-কে একশো-এর মধ্যে একশোই দিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এখন তো শনিবার এলেই প্রত্যাশা জাগে রোববার-এর জন্য। সবচেয়ে ভাল লেগেছে 'অভিষিক্তা' সংখ্যা। সত্যিই প্রতিবেদনটি অনবদ্য। বর্ণনার সাবলীলতায়, চলিত গদ্যের মুন্সিয়ানায় এবং সর্বোপরি অকপটতার জন্য প্রচ্ছদকাহিনিগুলো অত্যন্ত মনোগ্রাহী হয়েছে। আমি আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে পরম যত্নে রেখে দিয়েছি—বিবাহসূত্রে প্রবাসী আমার কন্যা এসে পড়বে বলে। সত্যিই রোববার-এর তুলনা হয় না।
সাধারণ পাঠক হিসাবে আমি রোববার-এর উন্নতি ও কুশল কামনা করি।

ডাঃ দীপান্বিতা হাজারি
কলকাতা-০৬

মুখ তেতো

২৯ এপ্রিল-এর 'অভিষিক্তা' সংখ্যায় অমিতাভকে নিয়ে দেবজ্যোতির লেখা বেশ ভাল লাগল। বচ্চনবাবুর আচার আচরণ নিয়ে (ছেলের বিয়েকে কেন্দ্র করে) ইদানীং আমাদের সকলের মুখ প্রায় তেতো হওয়ার উপক্রম। বউমার সঙ্গে এমন খোলামেলা 'পোজ' দেওয়ার কি সত্যিই কোনও প্রয়োজন আছে? অভি-ঐশ্বর্যর বিয়েটাকে ফিল্মের চিত্রনাট্য না বানালেই কি হত না? যতই রাখঢাক করে বাজার গরম করুন না কেন বচ্চন সাহেব—আমরা সবাই বুঝতে পারছি, এই বিয়েতে প্রাণের টানের অভাব আপনিও অনুভব করেছেন। দেখবেন, ছেলে-বউমার সাংসারিক জীবন না ফ্লপ হয়। তাহলেই সর্বনাশ। যাই হোক, অভি-অ্যাশ ভাল থাকুক—এটাই প্রার্থনা করি।

বিবেকানন্দ নস্কর,
ফলতা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

মুগ্ধ হয়ে গেছি

২৯ এপ্রিল-এর 'অভিষিক্তা' সংখ্যাটি অনবদ্য। আপনার লেখাটি পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেছি। আর দেবজ্যোতির লেখাটি পড়ে তো সারা সপ্তাহের জন্য মন ভাল হয়ে গেল। এমন রম্যরচনা কি প্রতি সংখ্যায় দেওয়া যায় না? মানুষ তো আজকাল হাসতে ভুলেই গিয়েছে। এরকম রচনা যদি বারবার পাই, আমার বিশ্বাস রোববার-এর পাঠকসমাজ অনেক-অনেকদিন আনন্দে থাকতে পারবে।

সোমনাথ ঘোষাল
সিঁথি

খুঁটিনাটি তথ্য

'অভিষিক্তা' সংখ্যায় অভি-অ্যাশ-এর বিয়ের খবর পড়ে খুব ভাল লাগল। বিশ্বসুন্দরীর বিয়ে এত জৌলুসহীনভাবে হতে পারে—ভাবাই যায় না। অমিতাভ বচ্চন মাত্র গুটিকতক গুণীজনকে নিমন্ত্রণ

করেছিলেন। যাদের না করলেই নয়। কি আর করবেন উনি। মা যে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে! যাই হোক, আপনি নিমন্ত্রিত ছিলেন বলেই, আমরা ওদের বিয়ের অনেক খুঁটিনাটি তথ্য জানতে পারলাম—যেমন, ঐশ্বর্যর পরিবার তেমনই বচ্চনের। ঐশ্বর্যর সাজপোশাক, গয়না, কনেচন্দন। জানলাম মেহেন্দি থেকে শুরু করে জয়া, অমিতাভ, অভির সাজ, ঐশ্বর্যর বাবা-মা, এমনকী অতিথি তালিকাও! সোনালী বেন্দ্রে, টিনা মুনিম, ডিম্পল, সঞ্জয়, করণ—কেউ বাদ নেই। কিন্তু, ব্রাত্য করে রাখলেন এমন একজনকে যিনি খুবই স্মরণীয়। তিনি জয়ার মা ইন্দিরা ভাদুরি। অন্যান্য সংবাদপত্রে পড়েছিলাম তিনি নাতির বিয়ের জন্য কলকাতা থেকে প্রচুর শপিং করেছিলেন। কিন্তু, ঋতুপর্ণ ঘোষ-এর লেখায় তাঁর কোনও স্থান হল না কেন? মনে রাখবেন, ইন্দিরা ভাদুরি কিন্তু সাংবাদিক-লেখক তরুণ ভাদুরির স্ত্রী। এই পরিচয়টা নিয়েই আলাদা করে ওনাকে নিয়ে একটা লেখা লিখুন না রোববার-এর পাতায়।

আর একটা লেখাও চাই। সপ্তাহে একদিন গৃহকর্ত্রীদের ছুটি দেওয়া যায় কি না সেটা নিয়ে। ছুটি মঞ্জুর হলে আমরা গৃহকর্ত্রীরা দ্বিগুণ উৎসাহে সংসারের সেবা করতে পারব!

লোপামুদ্রা মুখার্জি
বেহালা

ছোট মনের পরিচয়

'অভিষিক্তা' সংখ্যায় দেবজ্যোতির লেখা অসাধারণ। অনেক না বলা কথাই বলে দিয়েছে সে। সত্যি বলতে কী, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ—এইসবে অত বাছাবাছি চলে না। বাড়িতে বিয়ে লাগলে মানুষ পুরনো বিবাদও ভুলে যায়। অনেকদিনের বন্ধু-পরিচিত মানুষদের বিয়েতে আমন্ত্রণ না জানিয়ে, অমিতাভ নিজের ছোট মনেরই পরিচয় দিলেন। রাজকীয় বিয়ে নিয়ে প্রত্যেকেরই একটা উৎসাহ থাকে। বিয়ের আসরে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার থাকলে, মহাভারত কি অশুদ্ধ হয়ে যেত?

আশিস মিত্র
মহামায়াতলা, কলকাতা

বিতর্ক অর্থহীন

২৯ এপ্রিল-এর 'অভিষিক্তা' সংখ্যায় বাকবিতণ্ডা বিভাগে বেকার স্বামীর অ্যালিমনি পাওয়া উচিত কি না—এই বিষয়ে অনেক মত প্রকাশিত হয়েছে। পাঁচজন পক্ষে ও দু'জন বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কোথাও একটা জিনিস উঠে আসেনি। তা হল, চাকুরিরতা মেয়েরা বেকার স্বামীকে বিয়ে করেছে এমন ঘটনা কোথাও কি ঘটেছে? আজও পাত্রের উপার্জনক্ষেত্র সম্পর্কে পাত্রীপক্ষ ভালভাবে জেনে নেয়। আমার মনে হয় চাকুরিরতা মেয়েরা কখনও বেকারকে স্বামী হিসাবে বেছে নেয় না। তাই এই ধরনের বিতর্ক সম্পূর্ণ অর্থহীন। যাই হোক, অনেক না-পাওয়া নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল!

সুজিত কুমার বিশ্বাস
নদিয়া

অশান্তির বাতাবরণ

'উঠল বাই তো অ্যালিমনি চাই' শীর্ষক বাক-বিতণ্ডায় বিভিন্ন সেলিব্রিটির মনের কথা পড়লাম। তসলিমা নাসরিন যথার্থই প্রশ্ন তুলেছেন, ডিভোর্সের পর স্বামী 'হঠাৎ অ্যালিমনি পেতে যাবে কেন?' স্ত্রীদের উপর মাত্রাহীন অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্যই ডিভোর্স! একলা চলার নামই ডিভোর্স। কষ্টার্জিত ডিভোর্সের পর স্বামী-স্ত্রী তথা পুরুষ-নারীর সমতা নিয়ে তর্ক বা ঝড় তুললে—তা কি প্রহসনেরই নামান্তর হবে না? মুক্তির জন্যই যদি ডিভোর্স হয়, তবে ডিভোর্সের পর অ্যালিমনি নামক খোঁচাকে কেন্দ্র করে নতুন করে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করা কেন? গাঁটছড়া যখন ছিঁড়েই গিয়েছে, সম্পর্কের আগুন যখন নিভেই গিয়েছে, তখন অ্যালিমনি নামক ফুঁ দিয়ে সম্পর্কের ছাইকে ওড়ানোর চেষ্টা কেন?

হীরালাল শীল
কলকাতা- ১২

ভারসাম্য নষ্ট হবে

'উঠল বাই তো অ্যালিমনি চাই'—বাকবিতণ্ডা বিভাগে, ডিভোর্সের পর বেকার স্বামীর চাকুরিরতা প্রাক্তন স্ত্রীর কাছ থেকে অ্যালিমনি পাওয়া উচিত কি না— পড়লাম। অবশ্যই না। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর চাকুরিরতা স্ত্রী যখন ঘরে ফেরে, স্ত্রীর হাতে এক গ্লাস জল তুলে দিতে যেখানে বেকার স্বামীর পৌরুষে আঘাত লাগে—সেখানে ডিভোর্স-এর পর প্রাক্তন স্ত্রীর কাছ থেকে অ্যালিমনি আদায় করবার পর পুরুষত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে তো?

আর এখন তো কিছু পুরুষ চাকুরিরতা মেয়েদের ছলে-বলে-কৌশলে প্রেমের ফাঁদে ফেলে অনায়াসে পৌঁছে যাচ্ছে ছাদনাতলায়। কিছুদিন পর স্ত্রীর টাকাতেই প্রাক্তন বান্ধবীকে নিয়ে পাঁচতারা হোটেলে রাত কাটাচ্ছে! ডিভোর্সের পর এইরকম বেকার স্বামীর কি অ্যালিমনি পাওয়া উচিত? বেকার স্বামীরা যদি অ্যালিমনি পেতে শুরু করে, তাহলে বেকার ছেলেরা আর চাকরি খুঁজবে না, খুঁজবে চাকুরিরতা মেয়ে! ফলে সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হবে। সন্তানধারণ যেমন মেয়েদের কর্তব্য, তেমনই অ্যালিমনি পাওয়া মেয়েদেরই অধিকার, পুরুষের নয়।

প্রিয়ব্রত দত্ত
বনগাঁ, উত্তর চব্বিশ পরগনা

সংশোধনী

গত ১৫ জুলাই রোববার-এর 'বউদি' সংখ্যায় দেবজ্যোতির লেখার সঙ্গে ওপরের ছবিটি প্রকাশিত হয়। ওই লেখার সঙ্গে ছবিটির বাস্তব জীবনে কোনও সম্পর্কই নেই। যদি কারওর মনে আঘাত লেগে থাকে আমরা আন্তরিকভাবেই দুঃখিত।

---

২২ জুলাই নবনীতা দেবসেনের ভালো-বাসার বারান্দায় টোরোন্টোর পরিবর্তে ভুলবশত টরেন্টো ছাপা হয়েছে। এরজন্য আমরা দুঃখিত।

চিঠি পাঠাবার ঠিকানা
লেটার বক্স, রোববার
সংবাদ প্রতিদিন
২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০০৭২
ই-মেল :
robbar.pratidin@gmail.com
ফ্যাক্স : 22127977

ফা
ফার্স্ট
পার্সন

৯/১১-র পর থেকে আমার কয়েকবার আমেরিকা যাত্রার অভিজ্ঞতা নিয়ে কয়েকটি দৃশ্য বর্ণনা করা যায়। কোনওদিন চিত্রনাট্যে ব্যবহার করে ফেলবার আগে অন্তত তার সত্যিটা কোথাও ধরা থাক—

দৃশ্য এক

নিউ ইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটন ডিসি যাচ্ছি। আমেরিকার অর্ন্তদেশীয় বিমানে।

সিকিওরিটির লাইন থেকে হঠাৎ আমাকে আলাদা করে সরিয়ে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল লাইনের বাইরে।

লাইনে যাঁরা ছিলেন, এক এক করে পার হয়ে গেলেন—আমি দাঁড়িয়ে আছি এক অনন্ত অধৈর্য অপেক্ষায়।

যতবার জিজ্ঞেস করতে যাই, 'সমস্যাটা কী—কোনও সদুত্তর পাই না।

কে একজন নাকি সুপারভাইজার আছেন, তিনি আসছেন! বেশ!

আমি দাঁড়িয়ে আছি, আর আমার উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আমার ওপর আড়চোখে নজর রাখছেন এক বিশালদেহী কৃষ্ণাঙ্গ, বিমানবন্দরের সিকিওরিটি যুবক।

আমি কয়েকবার সসংকোচে তাকে জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করলাম, যে আর কতক্ষণ লাগবে?

যতবার আমি প্রশ্নটা তুলতে যাই, লোকটি মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

একবার চোখাচোখি হল। আমি প্রশ্নটা পাল্টালাম।

—Why you're picking me out like this? You know how it feels? Don't you?

কৃষ্ণাঙ্গ যুবক কী বুঝল কে জানে? ধীরে ধীরে চোখ নামিয়ে নিল।

আর চোখ তুলে তাকাল না। তারপর যতক্ষণ আমাকে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল, ইচ্ছে করেই যেন একবারও আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়নি—

দৃশ্য ২

অন্য এক বছর। সালটা মনে নেই। তারিখটা মনে আছে। ৪ঠা জুলাই।

আবার আমি নিউ ইয়র্কে। জর্জিয়া যাচ্ছি। বোর্ডিং অ্যানাউন্সমেন্ট হয়ে গেছে—আমি লাইনে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে এগোচ্ছি প্লেন-এর দিকে।

একটু দূরে মাটিতে বসে থাকা এক মধ্যপ্রাচ্যের প্রৌঢ় দম্পতিকে দেখে থমকে তাকালাম। তাঁদের থুম হয়ে বসে থাকার বিপর্যস্ত ভঙ্গি দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে ওঁদের ওপর জবরদস্ত খানাতল্লাসি চলেছে।

মেঝের ওপরে খোলা পড়ে রয়েছে স্যুটকেস। মাটিতে ছড়ানো রয়েছে সমস্ত জিনিস। জামাকাপড়, কাগজে মোড়া চটি, প্লাস্টিকের প্যাকেটে ডালমুট জাতীয় খাবার, ওষুধ, চশমা, নকল দাঁতের পাটি, এমনকী ভদ্রমহিলার অন্তর্বাস।

আমেরিকান পুলিশগুলো ভ্রূক্ষেপহীন। ওদের কাজ খানাতল্লাশি করা। অতএব কর্তব্য সেরে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে নিজেরা গল্প মশগুল।

আর, শীর্ণ প্রৌঢ় দম্পতি মেঝেতে বসে আছেন স্থবির, বাকশক্তিরহিত। তাঁদের একান্ত ব্যক্তিগত জগতটা সম্পূর্ণ ওলটপালট হয়ে যাওয়ার অভিঘাত লুকোনোর চেষ্টা করছেন শুষ্ক মুখমণ্ডলে তাম্রবর্ণ বলিরেখার আড়ালে। ভদ্রমহিলার মুখ বোরখার আড়ালে, কেবল শিরাওঠা দুটি করুণ হাত হাঁটুর ওপরে আলতো করে রাখা।

কেন যেন, আমার বাবা-মা'র কথা মনে হল। ঠিক মনে হল কোনও প্রবাসে ভিনদেশের মাটিতে বসে আছে বাবা-মা, সামনে ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে তাদের সাধের সংসার।

আমি লাইন ছেড়ে এগিয়ে গেলাম। এক একটা করে জিনিস তুলে রাখতে শুরু করলাম হাঁ করা স্যুটকেস-এর মধ্যে। ভদ্রলোক প্রথমে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বাধা দিতে চেয়েছিলেন। দেখলাম দুর্বল হাতদুটোর বাধা দেওয়ার ক্ষমতাও নেই।

তারপর কিছুক্ষণ আমাকে লক্ষ করার পর, হয়তো বা গায়ের রং দেখেও হবে, কতকটা যেন ভরসা পেলেন। একটা একটা করে জিনিস তুলতে লাগলেন স্যুটকেস-এ, আমার সঙ্গে হাতে হাত লাগিয়ে।

মেঝেতে একটা খালি প্লাস্টিকের প্যাকেট পড়েছিল। অন্তর্বাসগুলো তার মধ্যে কোনওরকমে চালান করে দিয়ে প্যাকেটটা এগিয়ে দিলাম ভদ্রমহিলার দিকে। শিরা ওঠা করুণ আঙুলগুলো কৃতজ্ঞতায় কোমল হল। প্যাকেটটা কোনওরকমে আমার হাত থেকে নিয়ে বোরখার আবরণে ক্ষিপ্রহাতে লুকিয়ে ফেললেন মহিলা।

আমেরিকান পুলিশগুলো এবার ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে আসছে এক আধজন। তাদের হাতে অ্যানাথ্রাক্স দস্তানা—হঠাৎ কোনও এক ভিনদেশিকে অপরিচিত মানুষের স্যুটকেস গোছাতে দেখে প্রথমটায় কিছুটা সন্দেহ হয়ে থাকবে। তারপর হয়তো স্বাভাবিক মানবিকতায়, তারাও উঁচু হয়ে মেঝেতে বসে হাত লাগাল স্যুটকেস গোছাতে।

আমার সঙ্গে একবার চোখাচোখি হল একজনের। স্বাভাবিক মার্কিন ভঙ্গিতেই বলল—হাই।

আমিও ততোধিক নির্লিপ্তভাবে বললাম—হাই! হ্যাপি ইনডিপেনডেন্স ডে।

দৃশ্য দুটি চিত্রনাট্যকারের কল্পনা নয়, ভুক্তভোগীর স্মৃতিচারণ। এই মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ এশীয় মানুষ লন্ডনে বা নিউইয়র্কে পা দেওয়া মাত্র এক কঠিন ইমিগ্রেশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। আর তার ওপর তিনি যদি মুসলমান ধর্মাবলম্বী হন, তাহলে তো কথাই নেই।

আমরা, সংখ্যাগরিষ্ঠরা, খুব সহজে মনে করি এটা তো ওদের সমস্যা—আমাদের নয়। খুব বেশি হলে দাড়িওয়ালা বন্ধুদের সতর্ক করে দিই—ওখানে গিয়ে

ঝামেলা করবে, দাড়িটা পারলে কেটে ফ্যাল।

কিন্তু ওস্তাদ রাশিদ খানের সঙ্গে সম্প্রতি যেটা হয়েছে শুনলাম, সেটা অত্যন্ত মর্মন্তুদ।

এবার উত্তর আমেরিকার বঙ্গ সম্মেলনে রাশিদ খানের গান গাইতে যাওয়ার কথা ছিল।

কলকাতার তরফের উদ্যোক্তাদের কারওর একটা কাছ থেকে শুনলাম রাশিদভাই যেতে চান না। এর আগে মার্কিন ইমিগ্রেশনে তাঁকে নানাভাবে নাজেহাল করা হয়েছে। তখনও ব্যাপারটার গুরুত্ব তেমনভাবে বুঝিনি।

মধ্যে কোনও একটা বিদেশ যাওয়ার সূত্রে প্লেন-এ দেখা হল রাশিদ ভাইয়ের সঙ্গে। জিজ্ঞেস করতেই কতকটা প্রাঞ্জল হল ব্যাপারটা।

'রশিদ খান' নামটার সঙ্গেই নাকি একটা সাঙ্কেতিক অ্যালার্ম আছে। ফলে যে কোনও দেশে ইমিগ্রেশনে এই নামধারী যে কোনও মানুষকে আটকানো হয়।

দুর্ভাগ্যবশত, পশ্চিম পৃথিবী 'রাশিদ খান' আর 'রশিদ খান'-এর তফাৎ করতে পারে না। ফলে গত কয়েকটি আমেরিকা-ভ্রমণ রাশিদভাইয়ের কাছে দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা।

তাঁকে বিবস্ত্র করে খানাতল্লাশি করা হয়েছে। এমনকী তাঁর প্রস্রাবের নমুনাটুকু নিয়ে পরীক্ষা করে মেলানো হয়েছে কোনও এক অদৃশ্য আততায়ীর সঙ্গে।

আর যতক্ষণ এই পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে, এই ভূমণ্ডলের দীপ্যতম সুরগন্ধর্ব অপমানে, গ্লানিতে মাথা হেঁট করে বসে থেকেছেন আমেরিকার কোনও এক এয়ারপোর্টে, এক দুঃসহ যন্ত্রণা নিয়ে।

রাশিদ খান আর আমেরিকা যেতে চান না। তাতে, আমেরিকার কী ক্ষতিবৃদ্ধি আমরা জানি না। কিন্তু আমাদের দেশের একজন সেরা গুণী মানুষকে যদি যে কোনও আন্তর্জাতিকতার সামনে থমকে দাঁড়াতে হয় এবং সংকুচিত পদক্ষেপে পিছিয়ে আসতে হয় কেবলমাত্র ইমিগ্রেশনের আতঙ্কে—তার প্রতিবিধান করার দায়িত্ব কি আমাদের সকলের নয়?

সৌরভবিহীন ভারতীয় দল মাঠে খেলতে নামলে আমরা সঙ্গতকারণেই ক্ষোভে, উষ্মায় ফেটে পড়ি।

রাশিদ খানের জন্য তাহলে কি আমরা কেউ কোনও প্রতিবাদ করব না? প্রতিকার ভ াব না?

আমি ধরেই নিচ্ছি, ঘটনাটা অনেকেই জানেন না।. জানলে প্রত্যেক রুচিবান মানুষই তাঁদের শোভন মানবাধিকারবোধেই এগিয়ে আসতেন।

আমার এই লেখাটা এখন যাঁরা পড়ছেন তাঁদের মধ্যে ক্ষমতাবান মানুষ নিশ্চয়ই কিছু আছেন।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সংস্কৃতিমন্ত্রীও বটে। এবং, কেন্দ্রীয় তথ্য সম্প্রচারমন্ত্রী ঘটনাচক্রে বঙ্গভাষী।

অন্তত ভাষার অন্তরায়ের কারণে আমার এই আবেদনটুকু দুজনের কারওর কাছেই অপ্রাঞ্জল হওয়ার কথা নয়।

দুজনের কাছেই আমার আবেদন, আমাদের দেশের এই মুহূর্তের অন্যতম সেরা গায়কের সম্মানের জন্য আমরা একটু সচেষ্ট হই না!

ঋতুপর্ণ ঘোষ

নবনীতা দেবসেনের সঙ্গে জাহিদা হিনা

নবনীতা দেবসেন

একদিনের কলকাতা দর্শন

আচ্ছা, যদি আপনার কোনও বন্ধু মাত্র একদিনের জন্য কলকাতাতে আসেন, জীবনে প্রথমবার, আপনি তাকে একদিনের মধ্যে কী কী দেখাবেন? প্রথমে তো বেশ ভাল করে তাকে ঘরের রান্না বাঙালি খানা খাইয়ে বাঙালি কালচারের স্বাদ দেবেন, তারপর সাইট সিইং করানোর পালা এলে কী করবেন?

আমাদের বন্ধু, পাকিস্তানী সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক, জাহিদা হিনা হঠাৎ সেদিন একদিনের জন্য করাচি থেকে কলকাতাতে চলে এসেছিলেন। এসে পড়ে নিজেই যারপরনাই মুগ্ধ, কেননা কলকাতাতে আসবার কথা তিনি নাকি কোনওদিনও ভাবেননি। অথচ অনেকবারই দিল্লিতে আসেন, বম্বে ও লখনউতেও গিয়েছেন, করাচি থেকে সেটা সম্ভব, মাঝে মাঝেই সেমিনার টেমিনার থাকে। রাজধানী বলে কথা, তাছাড়া পাড়াটাও পাকিস্তানের কাছাকাছি, নেই নেই করেও এখনও উর্দু ভাষীদের মধ্যে বেরাদরি আছে যথেষ্ট। দিল্লিতে কবি সম্মেলনে আহমদ ফারাজের মতো প্রসিদ্ধ পাকিস্তানি কবিদের উর্দু শায়েরি উচ্চারণের সময়ে দেখেছি পুরো অডিটোরিয়াম শুধু যে সমস্বরে বাঃ বাঃ করে তাই নয়, মাঝে মাঝে পরের লাইনে কবির সঙ্গে আবৃত্তিতে যোগও দেয়। কলকাতাতে ঠিক এই ব্যাপারটি আশা করা যায় কিনা জানি না। যদিও আমরা শামসুর রহমান জানি। কলকাতাতে আসতে হলে জাহিদার এখানে কোনও জরুরি কাজ থাকা চাই, অফিশিয়াল আমন্ত্রণ পত্তর দেখাতে হবে, তবে তো কলকাতার ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবেন? আয় চলে আয় কলকাতাতে, চুটিয়ে আড্ডা দিই গে ছাতে, বললেই কেউ পাকিস্তান থেকে চলে আসতে পারে না। ভিসা নিয়ে পাকিস্তান আর ভারতবর্ষের মধ্যে চমৎকার একটি সুস্থ বোঝাপড়া আছে, পৃথিবীর আর কোনও দেশের সঙ্গে এমন ব্যবস্থার কথা শুনিনি। শুধু দেশে প্রবেশের ভিসা নয়, কলকাতা, দিল্লি, জয়পুর, লখনউ, প্রত্যেকটি শহরে ঢুকতে আলাদা আলাদা ভিসা চাই। ভারতীয়রা পাকিস্তানে গেলেও তাই, করাচি, লাহোর, পিণ্ডি, হরপ্পা মহেনজোদাড়ো সব আলাদা ভিসা। পাকিস্তানীরা ভারতে এলেও তাই। মাননীয় সন্ত্রাসবাদের কল্যাণে এই সুবন্দোবস্ত। যারা অবশ্য বোমাবাজি করবার, সে বীরপুরুষদের ওসব তুচ্ছ ভিসা টিসা লাগে না। সারা বিশ্ব জুড়েই নিরাপত্তার এই লোক দেখানো বাড়াবাড়ি কার্যত শুধু নিরীহ, ভীরু ভ্রমণকারীদের নাস্তানাবুদ করার জন্য। পাকিস্তানী বন্ধুদের সঙ্গে তাই দিল্লিতেই সাক্ষাৎ হয়, এখানে বড় একটা উজিয়ে আসেন না কেউই।

সম্প্রতি ভারতীয় ভাষা পরিষদে চমৎকার এক সাহিত্য সম্মেলনে যেন আমারই উপকার করতে একগুচ্ছ পুরনো লেখক বন্ধু-বান্ধবকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন কোণ থেকে কলকাতাতে এনে জড়ো করে ফেলেছিলেন অধ্যক্ষ শ্রী ইন্দ্রনাথ চৌধুরী। আমার আহ্লাদের সীমা ছিল না, বন্ধুদের সকলেরই তো বয়স হচ্ছে, মেলামেশা, দেখাশোনার সুযোগ আগের তুলনায় কমে যাচ্ছে। কর্ণাটক থেকে ইউ আর অনন্তমূর্তি, গুজরাট থেকে সিতাংশু যশশ্চন্দ্র, কেরালা থেকে এমটি বাসুদেবন নায়ার, দিল্লি থেকে গিরিরাজ কিশোর, প্রত্যেকেই যে যার ভাষার সাহিত্যে শিখরচুম্বী নাম। দেখা হল, আড্ডা হল, খুব ভাল লাগল।

শুধু ভারতবর্ষ নয় বাংলাদেশ আর পাকিস্তানের কথাও ইন্দ্রনাথ ভোলেননি, এনেছিলেন দুজন নারী লেখককে, ঢাকা থেকে সেলিনা হোসেন আর করাচি থেকে জাহিদা হিনাকে। কিন্তু জাহিদার ভিসার গোলমালে বেচারার সেমিনারের পুরো সময়টা থাকা হল না শুধু সমাপ্তির সভাতে উপস্থিত হতে ও ভাষণ দিতে পেরেছিলেন। তারপরের দিনটি ফ্রি, কলকাতা শহর ঘুরে দেখে, ভোরে উঠে চলে যাবেন দিল্লি। আমি ওঁকে কী দেখাবো? একদিনের কিংবা আধদিনের কলিকাতা দর্শন নিশ্চয়ই টুরিস্ট বাসে সম্ভব, বড় হোটেলগুলো থেকে ছাড়ে. কিন্তু সে সব দ্রষ্টব্যে তাঁর উৎসাহ না থাকতে পারে। আমার বেজায় ভাবনা হয়ে গেল। দেখি, তিনি কী কী দেখতে চান

—তুমি কী কী দেখতে চাও, জাহিদা?

—বই-এর দোকান।

—তাহলে তো কলেজ স্ট্রিট, কিন্তু তুমি তো বাংলা বই পড়তে পারো না।

—আমি ভাল আধুনিক ইংরিজি বই-এর দোকানে যেতে চাই।

আমি তাকে কয়েকটি ভাল ইংরিজি বই-এর দোকানে, অর্থাৎ সীগালে, অক্সফোর্ডে আর ক্রসোয়র্ডসে নিয়ে গেলুম। এবং আমাদের পাড়াতে পূর্ণ দাস রোডের সুন্দর নতুন দোকানেও। কয়েকটা বই কিনলেন তিনি, তিনি চান আম্রপালীর ওপরে খবরওলা ইংরিজি বই, প্রাচীন যুগের বারাঙ্গনাবৃত্তি নিয়ে উপন্যাস লিখবেন। কোনও দোকানেই সুবিধা হল না। কলেজ স্ট্রিটে ইন্ডিয়ানাতে যেতে বলি। অর্ডার দিলে অমিত এনে দেবে। কিন্তু কী বই চাই তাই তো জাহিদার জানা নেই।

—তাহলে তুমি আগে লাইব্রেরিতে যাও? নিদেনপক্ষে ইন্টারনেটে যাও? আম্রপালী খোঁজো। বই-এর দোকান তো দিল্লিতেও পাবে, এখানে তুমি আর কী দেখবে?

—ইউ সাজেস্ট।

—সাজেস্ট তো কত কিছুই করা যায়, তোমার হাতে সময় কই? বিড়লা তারামণ্ডল আর সায়েন্স সিটি দেখানোর সময় নেই, আমার তো খুব ভাল লাগে। কিন্তু বড়রা দেখতে চায় না। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মিউজিয়াম দ্যাখো, সে তো তোমাদেরও পূর্ব ইতিহাস, ফোর্ট উইলিয়াম, ময়দান, অক্টারলোনি মনুমেন্ট, রাজ ভবন, কলকাতার টাউনহলের ইন্টার-অ্যাক্টিভ যাদুঘর দ্যাখো, চমৎকার কলকাতার জন্ম ইতিহাস, সে তো ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিকতারও জন্ম কাহিনি, কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতার যাদুঘরটিও খুব ভাল, রবীন্দ্রনাথের জন্মস্থান জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি অবশ্যই দ্যাখো, টিপু সুলতানের মসজিদ দ্যাখো, সেও তোমার আমার অভিন্ন ইতিহাস। সংস্কৃতির প্রসঙ্গে কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউস দ্যাখো, তুমি তো লেখক, প্রেসিডেন্সি কলেজ—এতক্ষণে জাহিদা হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে ওঠেন।

—প্রেসিডেন্সি কলেজ। আমার ঠাকুর্দার কলেজ ওঠা। ওঁরা তো কলকাতাতেই পড়াশোনা করেছেন। দেখা যাবে?

—কেন যাবে না, প্রসঙ্গত, ওটা আমারও কলেজ। প্রেসিডেন্সি, কফি হাউস, কলেজ স্ট্রিট, সব একই জায়গাতে। তাঁর যৌবনকালে তোমার ঠাকুর্দা ওইখানেই হেঁটে বেড়াতেন, বইটই কিনতেন, মিটিং করতেন, কী জানি তখন অ্যালবার্ট হল ছিল কিনা? চাইলে ফিরিঙ্গি কালীবাড়িও দেখে আসতে পারো, কাছেই, বারাঙ্গনাপল্লিও দূরে নয়, অনেক অদলবদল হচ্ছে সেখানে, নানা ধরনের সচেতনতার প্রোগ্রাম চলছে। কিন্তু তুমি তো প্রাচীন কালের খবর চাও। তা কি ওখানে পাবে? বৌবাজারে বিখ্যাত বাঈজিদের পাড়া ছিল, সে ঠিক বারাঙ্গনাপল্লি নয়, এখন কিছু আছে কি না জানি না, আমি আপন মনে গুজগুজ করে আউড়ে যেতে থাকি, জাহিদা একমনে শুনতে থাকেন, কোনও মন্তব্য করেননা,—উত্তরে দ্রষ্টব্য আছে জৈনদের পরেশনাথের মন্দির, আর দক্ষিণে আমাদের এই বাড়ির কাছেই কলকাতার আরেক দ্রষ্টব্য, কালীঘাট, অবশ্য তার চেয়ে সময় থাকলে বেলুড়ে, কি দক্ষিণেশ্বরে গেলে বেশি ভাল লাগত। তবে কলকাতার মন্দিরগুলো সব বাদ দেওয়াই ভাল, এ তো উড়িষ্যা নয়, বিষ্ণুপুরও নয়, ওদের বহিরঙ্গে তো তেমন কোনও শিল্পের সৌন্দর্য নেই। কী দেখবে? অবশ্য হয়েছে এক বিড়লা মন্দির,

ভিসা নিয়ে পাকিস্তান আর ভারতবর্ষের মধ্যে চমৎকার একটি সুস্থ বোঝাপড়া আছে, পৃথিবীর আর কোনও দেশের সঙ্গে এমন ব্যবস্থার কথা শুনিনি। শুধু দেশে প্রবেশের ভিসা নয়, কলকাতা, দিল্লি, জয়পুর, লখনউ, প্রত্যেকটি শহরে ঢুকতে আলাদা আলাদা ভিসা চাই। ভারতীয়রা পাকিস্তানে গেলেও তাই, করাচি, লাহোর, পিণ্ডি, হরপ্পা মহেনজোদাড়ো সব আলাদা ভিসা

অনেক কারুকার্য খচিত নতুন মন্দির। বরং উত্তর কলকাতাতে যাচ্ছো, নাখোদা মসজিদ দেখে আসতে পারো। নাখোদা মসজিদের দীর্ঘ ইতিহাস আছে, বঙ্গভঙ্গের সঙ্গেও নামটি জড়ানো। রাখীবন্ধনের দিন রবীন্দ্রনাথ তাঁর দলবল নিয়ে ওখানে গিয়ে মসজিদে যাঁরা ছিলেন তাদের রাখী পরিয়েছিলেন এবং কোলাকুলি করেছিলেন পরস্পরের সঙ্গে।

—নাখোদা মসজিদ? জাহিদা যেন ঘুম ভেঙে মহোৎসাহে উঠে বসলেন। গুড! তাহলে আমি করাচিতে ফিরে বলতে পারব কলকাতাতে গিয়ে নাখোদা মসজিদ দেখে এসেছি। ওটা সবার জানা।

—কিন্তু মেয়েদের কি ঢুকতে দেবে?

—ঢুকতে চাই না তো? তুমি যে অনন্ত লিস্টি দিলে তাতে তো কোথাও ঢোকার প্রশ্ন নেই। সব ওই বাইরে থেকে চোখের দেখা। চৌরঙ্গী দেখা হবে তো?

—হবে। হাওড়া ব্রিজও দেখা উচিত তোমার, অন্তত নতুনটা। আর অজস্র আর্ট গ্যালারি আছে, দারুন সব ছবি, অজস্র ভাল থিয়েটার আছে, শুধু বাংলা নয়, হিন্দিতেও ঊষা গাঙ্গুলির দল, প্রতিভা অগ্রবালের দল, কিন্তু তোমার সময় কই? দিশি শপিং-এর জন্য দক্ষিণাপন, স্বভূমি। আর অজস্র বিদেশি চেহারার মল, কিন্তু এগুলো হয়তো পাকিস্তানেও আছে। দিল্লিতে যেতে এত তাড়া কেন? অনেকবার তো গিয়েছ দিল্লিতে। থাকো না দুদিন।

দুর্ভাগ্যবশত যেদিনটি জাহিদা ফ্রি সেই দিন আমি খুবই ব্যস্ত, তাই বই-এর দোকানের পরে লাঞ্চ, তারপরে ওকে একটি গাড়ি ভাড়া করে দিলুম, জয় ছেলেটি শিক্ষিত, বিশ্বাসযোগ্য সঙ্গী-কাম-গাইড হতে পারবে। বেছে একটি তালিকা তৈরি করে দিলুম জাহিদার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মোটামুটি সম্ভাব্য দ্রষ্টব্যের। ভিতরে প্রবেশের দরকার নেই। এক একটি দেখাবে, আর টিক-মার্ক দেবে। সারা দুপুর বিকেল সন্ধ্যে আছে রাত পর্যন্ত।

রাত্রে জয় ফোন করে বিজয়গর্বে জানাল লিস্টির প্রত্যেকটি দ্রষ্টব্য সে ম্যাডামকে বাইরে থেকে দেখিয়েছে, টাউন হলের ভিতরে ঢোকেননি, ভিক্টোরিয়াতেও না রবীন্দ্রনাথের বাড়িতেও না, মিউজিয়ামেও না, ন্যাশনাল লাইব্রেরিতেও না, শুধু কলেজ স্ট্রিটে নেমে বই-এর দোকানে, প্রেসিডেন্সিতে আর কফি হাউসে একবার করে ঢুকেছিলেন, নাখোদা মসজিদ, টিপু সুলতানের মসজিদ, কোথাও নামেননি, একবার ফোর্ট উইলিয়ামে ব্ল্যাক হোল অফ ক্যালকাটার হলওয়েল মনুমেন্ট দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেটা কোথায় জয় জানে না তাই নামায়নি। যা বুঝলাম জাহিদার অনেক বেড়ানো হয়েছে সারা কলকাতা জুড়ে। প্রচুর রসদ সংগ্রহ হয়েছে কাগজে লেখবার মতো, একদিনের কলিকাতা সন্দর্শন। হলওয়েল মনুমেন্ট তো ফোর্টে নেই, আছে পার্ক সার্কাসে ফিরিঙ্গিদের গোরস্থানে। মনে পড়তেই খুব আফশোস হল। আহা, ওঁকে একবার পার্ক সার্কাসে ঘুরিয়ে আনা হল না? ওর মনে হত বুঝি আর পশ্চিমবঙ্গে নেই, পথ ভুলে পাকিস্তানেই চলে এসেছেন, চারিদিকে উর্দু ভাষায় বিজ্ঞাপন, উর্দু পোস্টার, উর্দু স্লোগান দেওয়ালে দেওয়ালে, বুরখা ঢাকা মেয়েরা, চাঁদি ঢাকা টুপি মাথায় কুর্তা পাজামা পরা পুরুষ রাস্তা ঘাটে। এরকম দেবনাগরী ভর্তি হিন্দু পল্লি, কি গুরুমুখী ভরা শিখ পাড়া কি আমরা পাবো করাচিতে? আহা, জয়কে বলে দেওয়া হয়নি, বোকামি হয়েছে আমার।

জয় রিপোর্ট দেওয়ার পরেরদিন জাহিদা দিল্লি থেকে ফোন করলেন।

—ধন্যবাদ, অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্যি সত্যি আমি তোমার তালিকা মিলিয়ে কোলকাতা দেখেছি। কিচ্ছু বাদ নেই। ড্রাইভারটি খুব চমৎকার। খুব ভদ্র, যত্ন করে ঘুরিয়েছে, লিস্টের বাইরেও দেখিয়েছে, ইডেন গার্ডেন , রাজভবন, জিপিও, রাইটার্স বিল্ডিং, হিন্দিতে সব রানিং কমেন্টারি দিয়েছে, চৌরঙ্গীর গ্র্যান্ড হোটেল আগে অন্যরকম ছিল, এটা নতুন, রবীন্দ্রনাথের আসল দ্রষ্টব্য স্থল কিন্তু শান্তিনিকেতনে, তাও বলেছে, অক্টারলোনি মনুমেন্টে এখন রাত্রে আলো জ্বলে আগে জ্বলতো না, আর মাথাটা লাল রঙের ছিল, এরকম অনেক জ্ঞান দিয়েছে আমাকে। খিল খিল করে হাসতে হাসতে জাহিদা আমাকে বললেন, ড্রাইভার আমাকে অনেক জরুরি খবরও দিয়েছে, গোপনে বলেছে, নাখোদা মসজিদ খুব ডেনজারাস জায়গা ম্যাডাম, না যাওয়াই ভালো। জানেন তো, ওখানে মুসলমানেরা পাকিস্তান থেকে প্রচুর অস্ত্র শস্ত্র এনে জমা করে রেখেছে, আমাদের একদিন শেষ করে দেবে। আইএসআই-এর চক্রান্ত হয় ওইখানে, যত পাকিস্তানের স্পাইদের আড্ডা, বাংলাদেশী গুণ্ডারা এসে ওইখানে লুকিয়ে বোমা তৈরি করে, বুঝলেন ম্যাডাম? সব ওই সৌদি আরবের পয়সাতে। আমাদের কাবলা সরকার কোনও কম্মের নয় কিচ্ছু আটকাতে পারে না। আপনাদের দিল্লি অনেক ভাল। করুক দেখি জুম্মা মসজিদে এই সব কাণ্ড?

জাহিদার ঢেউ তোলা, পেট ফাটা, অট্টহাসিতে আমার কান আগুন হয়ে যেতে থাকল, ছি ছি! আমাদের এত গর্বের ধন, ধর্মনিরপেক্ষ কলকাতার রাজনৈতিকসচেতন, টলারেন্ট, সেকুলার সাধারণ মানুষের সম্বন্ধে কিনা এই ধারনা নিয়ে গেলেন জাহিদা? হায়, এত করে জাহিদাকে ঔপনিবেশিক কলিকাতা প্রদর্শন, সব তাহলে একা নাখোদারই ভোগে চলে গেল। সাংবাদিকের মশলালোলুপ জিভে জয়ের দেওয়া খবরটাই তো হবে মুখ্য সুস্বাদ। জয় একটা কথা বলেছিল বটে ফোনে, তখন ঠিক খেয়াল করিনি। এবার তার নিহিতার্থ টের পেলুম।

—ম্যাডামকে রামকৃষ্ণ মিশনে ছেড়ে এসেছি। ওকে বলেছিলাম, কিন্তু উনি ফিরিঙ্গি কালীবাড়িতে ইন্টারেস্টেড ছিলেন না। অবশ্য উনি তো দিল্লির লোক, দিল্লির কালীবাড়ি অনেক বড়।

জাহিদা পাকিস্তানী, জয়কে সেটা বলা হয়নি।

সে ছিল জুনের মাঝামাঝি, করাচির লাল মসজিদের রক্তাক্ত ঘটনা তখনও ঘটেনি।

বর্ষাফূর্তি সম্ভার

"আগামীকাল বজ্রবিদ্যুৎসহ
বৃষ্টির সম্ভাবনা।"

শ্রীলেদার্স আছে তো!

60404

Rs. 124/-

শ্রীলেদার্স নিয়ে এলো বর্ষার দারুণ কালেকশন "বর্ষাফূর্তি সম্ভার"।
ফাটাফাটি কালার রেঞ্জ। দাম একদম নাগালের মধ্যেই।

Sreeleathers
বিশ্বমান। খাঁটি দাম।

Genesis 2333

এবার
মলাট

শ্রাবণসন্ধ্যা

এই শ্রাবণে জেগে থাক
মায়াবতী মেঘ, এই বর্ষণে
আঁকা থাক ঘুমঘুম তারা
ঝিকিমিকি চাঁদ আর এই
ঝোড়োবাতাসের শতাব্দীতে
লেখা থাক গীতশ্রী সন্ধ্যা
মুখোপাধ্যায়ের নাম—পঁচাত্তর
বছর বেরিয়েও যে নাম
শান্তশীতল বাঙালি জীবনের
সমার্থক, নিস্তরঙ্গ শ্রাবণধারায়
অমলিন।
অতনু চক্রবর্তী

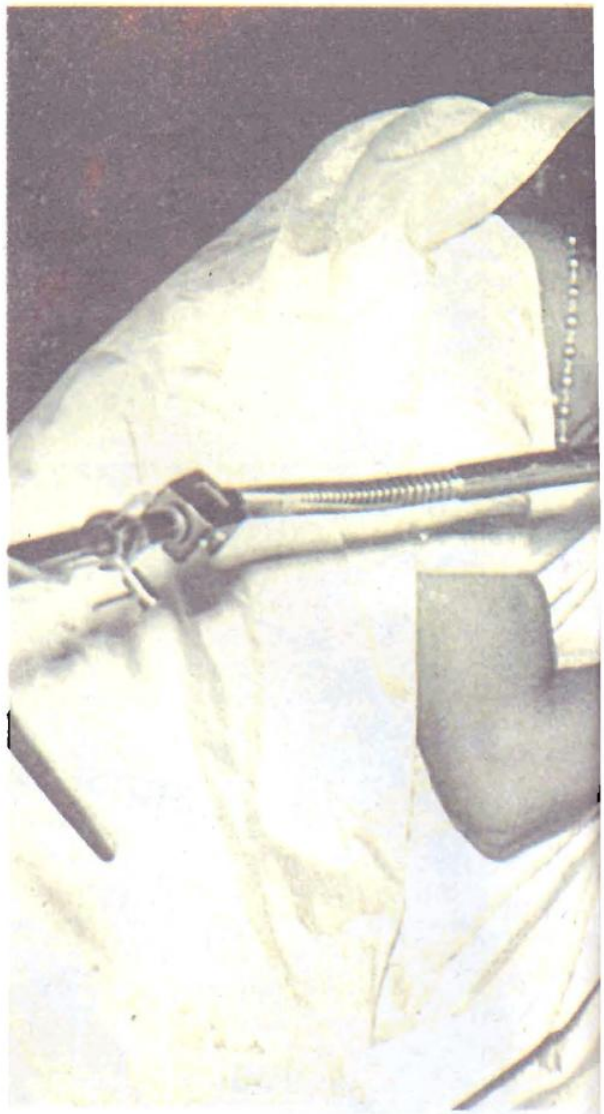

উস্তাদ আলি আকবর খাঁ-কে সম্বর্ধনা

দুজনের মধ্যে অনেক মিল। একজন চলে গেছেন 'স্বেচ্ছা নির্বাসনে'—ধরা ছোঁয়ার বাইরে, তাঁকে নিয়ে কষ্টকল্পনা চলে; অন্যজন রয়েছেন 'ইচ্ছা নির্বাসনে', তিনি মাঝেমধ্যে ইচ্ছে হলে ধরা দেন, অন্যথায় থাকেন নিজস্ব বৃত্তের ঘেরাটোপের ভেতর। বাংলা ছবির ফার্স্ট লেডি কানন দেবীর হাত থেকে দু'জনে বুঝে নিয়েছিলেন দুটি দায়িত্ব, একজন রুপোলি পর্দায় 'রূপ'-'কলা'র দ্যুতি ছড়িয়েছেন অন্যজন সুরের মায়ায় জড়িয়ে নিয়েছেন সুরপিয়াসীদের। একজন নায়িকা হিসেবে সিনেমাকে দিয়েছেন বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা, অন্যজন গায়িকা হিসেবে প্লে-ব্যাককে দিয়েছেন ভিন্ন মাত্রার পূর্ণতা, বাংলা গানে গড়ে নিয়েছেন নিজস্ব ঘরানা। সুচিত্রা সেন আর সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় দুই কিংবদন্তীর মিলিত মাধুরী রূপকথা হয়ে আছে। দুজনেই হয়ে গেছেন বঙ্গসংস্কৃতির অঙ্গ। সেক্ষেত্রে আবার সুচিত্রার সঙ্গে জড়িয়ে আছেন উত্তম, সন্ধ্যার সঙ্গে হেমন্ত, বাঙালির চার চোখের মণি। সেই 'অগ্নিপরীক্ষা'য় উত্তীর্ণ সুচিত্রা-সন্ধ্যা ছ'দশক পেরিয়ে পরস্পরের 'প্রিয় বান্ধবী'। এর মাঝখানে রয়ে গেছে এক আকাশ গানের ইন্দ্রধনু। তবে এটি কিন্নরকণ্ঠীর শিল্পীজীবনের একটি পর্যায় মাত্র। সুচিত্রার আগেও সন্ধ্যা ছিলেন স্বমহিমায়, রয়েছেন সুচিত্রার নির্বাসনের পরেও ; বহুমুখী সৃষ্টির উৎসবে ছ'দশক ধরে সক্রিয়। তেত্রিশ বছর আগে সুচিত্রা সেনের জন্য 'শ্রাবণ সন্ধ্যা' ছবিতে সন্ধ্যা গেয়েছিলেন 'দু চোখের বৃষ্টি ভিজে ভিজে'। আজ এই ভরা শ্রাবণের সন্ধ্যায়, সম্প্রতি প্রকাশিত সন্ধ্যার রাগসঙ্গীতের অ্যালবামের 'মালকৌষ' বাজছে। শুনতে শুনতে মেঘদূতের উত্তর মেঘের মতো ভেসে আসে, সময়কে পেরিয়ে আসা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গানমালা—সুরবাহার। গোঁয়ার মাছির মতো ঘুরেফিরে আসে অসংখ্য গানের কলি। কানের ভেতর, নাকি মস্তিষ্কে ভাঙতে থাকে গানের ঢেউ—গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু, মায়াবতী মেঘে এল তন্দ্রা, বাঁধো ঝুলনা, উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা, মধুমালতী ডাকে আয়, বকম বকম পায়রা, যদি নাম ধরে তারে ডাকি, মধুর মধুর বংশী বাজে, ওগো মোর গীতিময়, তীর বেঁধা পাখি আর গাইবে না গান, নতুন সূর্য আলো দাও, চন্দন পালঙ্কে শুয়ে... ক্রমশ ছড়িয়ে দেয় কুয়াশার মতো স্মৃতিমেদুরতা। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় নামটিই ঝঙ্কার তোলে, যে কণ্ঠের মহিমায় যে, কোনও দিনই হয়ে যায় গানের, যে কোনও লগ্নই হয়ে ওঠে গান শোনার।

'সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় বাংলা গানের একটা পুরো

অধ্যায়'—তার মধ্যে রয়েছে নানা পরিচ্ছেদ—অনুপম-সন্ধ্যা, রবীন-সন্ধ্যা, হেমন্ত-সন্ধ্যা, মানবেন্দ্র-সন্ধ্যা, মান্না-সন্ধ্যা, সলিল-সন্ধ্যা, গৌরীপ্রসন্ন-সন্ধ্যা, শ্যামল গুপ্ত-সন্ধ্যা থেকে সুমন চট্টোপাধ্যায়-সন্ধ্যা কিংবা রবীন্দ্রগান-নজরুলগীতি সন্ধ্যা, গীতিনাট্যের গান বা পাতিয়ালা ঘরানার উত্তরসূরি সন্ধ্যা এমন বহু উজ্জ্বল রঙে ভরে আছে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের শিল্পীজীবনের ক্যানভাস। 'লিভিং লেজেন্ড' বিশেষণ বসানোর পক্ষে আদর্শ নাম সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

উনিশশো তেতাল্লিশে গল্পদাদুর আসরে গান গাওয়া থেকেই হোক বা উনিশশো পঁয়তাল্লিশে আধুনিক গানের প্রথম রেকর্ড অথবা আটচল্লিশে 'আনজান গড়' ছবিতে প্রথম প্লে-ব্যাকের দিন থেকে হিসেব করা হোক, গানে গানে ষাট বছর পেরিয়ে এসেছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। বহু গুরুর তালিম, গুণী সঙ্গীত পরিচালকদের সান্নিধ্যে বিকশিত প্রতিভা সন্ধ্যার কণ্ঠমহিমা এবং গভীর উপলব্ধি থেকে উঠে আসা গায়নশৈলি এতটাই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে আজকের 'ক্লোন' অধ্যুষিত [illegible]রেও 'সন্ধ্যাকণ্ঠী' হওয়ার মতো দুঃসাহসী অভিযাত্রী সুলভ নয়। আজও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় নিজেই নিজের তুলনা। তাঁকে নিয়ে সঙ্গীতরসিকদের আগ্রহে ভাটা পড়েনি কখনও।

রেকর্ড কোম্পানি উদগ্রীব, দিদির ইচ্ছে হলেই একমাসের মধ্যে রেকর্ডিং-এর যাবতীয় ব্যবস্থা প্রস্তুত করে দিতে। জলসায় গান গাইবার প্রস্তাব নিয়ে চটি ক্ষইয়ে ফেলেন অর্গানাইজার। এক আধজন বিরল সৌভাগ্যবান ছাড়া কারও শিল্পীর মুখোমুখি হওয়ারই সুযোগ মেলে না। দু-হাজার চার সালে সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামের জলসায় শেষবার শোনা গেছে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গান। তার আগে নজরুল মঞ্চে মান্না দে'র সঙ্গে জলসায় কলকাতা দেখেছিল সন্ধ্যা অনুরাগীদের উন্মাদনা। দু'বছর আগের নববর্ষে গানমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বহু উপরোধে খালি গলায় দু'কলি গান গেয়ে রবীন্দ্রসদন উদ্ভাসিত করে দিয়েছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, বুঝিয়ে দিয়েছিলেন আজও তিনি সুরসাগরের কতখানি নিপুণ ডুবুরি। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের নতুন গানের রেকর্ড শেষ প্রকাশিত হয়েছিল বোধহয় বছর পাঁচেক আগে—'অশ্বমেধের ঘোড়া'। তার আগের বছর বেরিয়েছিল 'সাদা পায়রা গিয়েছে উড়ে' এবং একটি ভজনের অ্যালবাম। অর্থাৎ অন্তত বছর তিনেক সন্ধ্যাকণ্ঠের মাধুরী পেতে শ্রোতাকে অতীতেরই শরণ নিতে হয়েছে। কিন্তু গান সন্ধ্যার জীবনচর্যা—তাই গত বছরের ভীষণ অসুস্থতার সময়টুকু বাদ

ইন্ডিয়া ল্যাব স্টুডিওতে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মহড়ায়

দিয়ে সুরের সঙ্গে আত্মীয়তায় টান পড়েনি শিল্পীর। লেক গার্ডেন্সের ছিমছাম শান্ত বাড়ির বাতাসে নিয়মিত গুঞ্জরিত হয় কিন্নরকণ্ঠীর গান। স্বভাব সারল্যে নিজের মধ্যেই মগ্ন, আবেগপ্রবণ এই শিল্পী কী করছেন, কবে বেরবে তাঁর পরবর্তী অ্যালবাম, কবে তাকে পাওয়া যাবে টিভির পর্দায়, কেন তাঁর অনুপস্থিতি—এসব নিয়ে বিস্তর জল্পনা চলে। নিজস্ব ঘেরাটোপের বাইরে শিল্পীকে পেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মিডিয়া, ক্ষুধার্ত হয়ে ওঠে আলোকচিত্রীরা। কিন্তু এমন ঘটনা বেশি ঘটে না। প্রতিরোধের এই দেওয়াল তোলবার জন্য অনেকেই দায়ী করেন শিল্পীর স্বামীকে। তাঁর অপ্রিয় ভাষণে হয়তো, অনেকেই আহত হন। কিন্তু স্বাধীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীত রচয়িতা শ্যামল গুপ্ত তাঁর কিংবদন্তী কণ্ঠশিল্পী স্ত্রীকে প্রায় চল্লিশ বছর ধরে দিতে চেয়েছেন স্বস্তির আবহ, নিশ্চিন্ত সাধনা-চর্চার অবকাশ। নষ্ট হতে দেননি শিল্পীর মনঃসংযোগের অনুকূল পরিবেশ। ফলে কারণে অকারণে পাওয়া যায়নি সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার কিংবা 'বাইট' স্পনসরড আড্ডায়

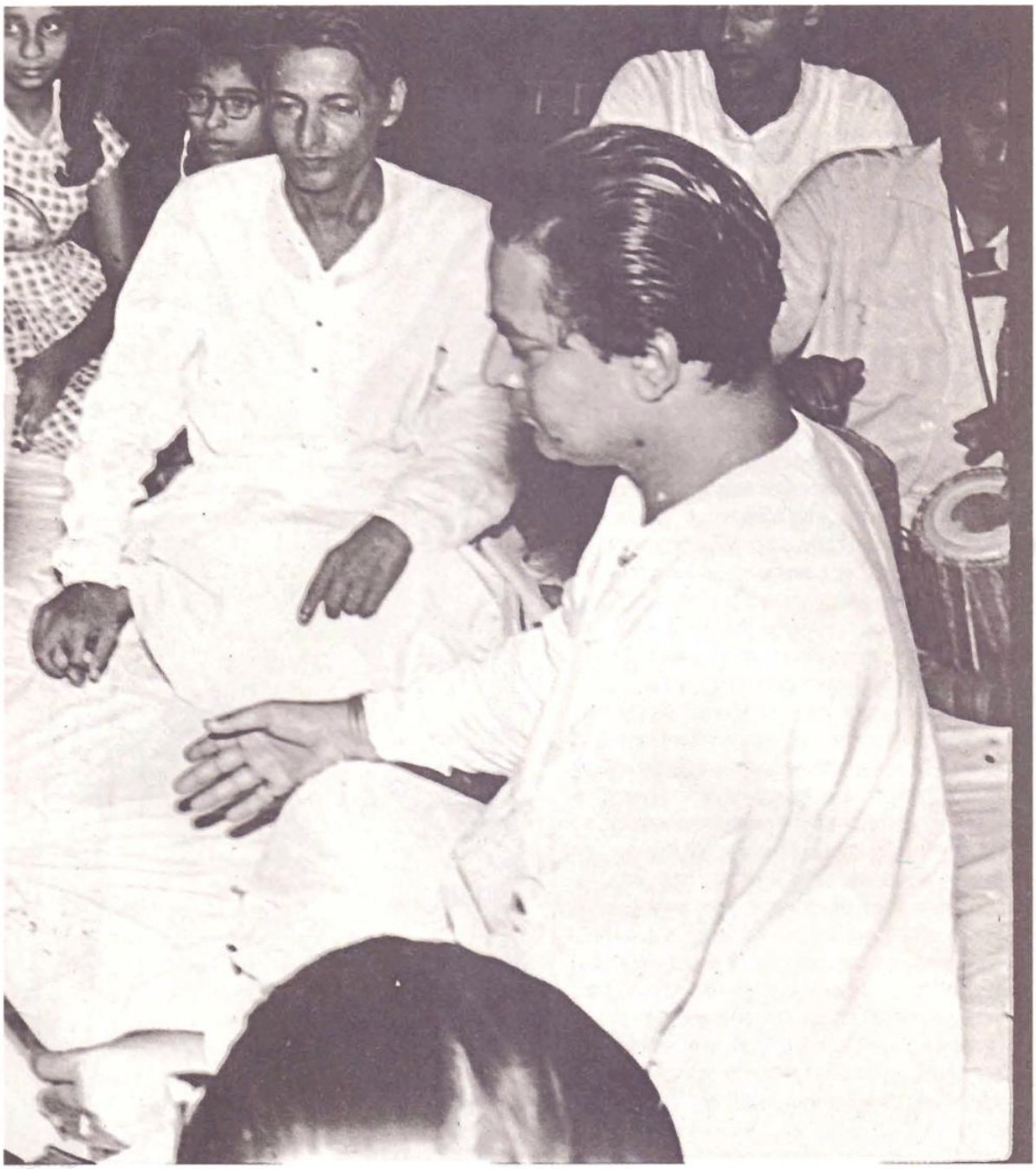

সামিল করা যায়নি তাঁকে। ব্যাঙের ছাতার মতো বেড়ে চলা রিয়্যালিটি শো'য়ে বিচারকের আসনে বসবার মতো ক্লান্তিকর ব্যায়ামের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন শিল্পী। সব মিলিয়ে এক ধরনের রহস্যময়তা ঘিরে রেখেছে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে অথচ ঘরোয়া পরিবেশে বা বাইরে সর্বদাই মানুষ সন্ধ্যা সনাতন ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতীক। অতিথিরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারেন তাঁর স্নেহশীলা মাতৃময়ী রূপ। আশ্চর্য! তাঁর কণ্ঠে যত গ্ল্যামার তাঁর পরিচ্ছদ ততই আটপৌরে, যতটা খ্যাতি তাঁকে ঘিরে আছে, ততটাই সারল্য তাঁর জীবনযাপনে। সাফল্য-প্রতিষ্ঠা-খ্যাতি এতটুকু ভাঁজ ফেলেনি তাঁর আন্তরিকতায়, নিষ্ঠায়। কোনও কথায় হয়তো শিশুর মতো উচ্ছ্বাসী হয়ে ওঠেন, পরক্ষণেই হারিয়ে যান বিষয়ের গভীরে। আপাতদৃষ্টিতে সহজ আচরণের ভেতরে অলক্ষে উঁকি দেয় দৃঢ়চেতা আত্মবিশ্বাসী এক মানসিকতা যার পোষাকী নাম প্রত্যয়। আলাপনে সহজিয়া বাক্যের গভীরেও ভেসে থাকে সেই প্রত্যয়। জাতীয় সম্পদ এই শিল্পী কেন এড়িয়ে চলেন,

তাঁর কাছে পৌঁছবার জন্য উদগ্রীব মানুষজনকে—এই অনিবার্য প্রশ্নের উত্তরেও সহজ সাবলীল সন্ধ্যাকণ্ঠ—'নিজেকে আড়ালে রাখার প্রবণতাটা আমার স্বভাবের মধ্যে রয়েছে। আমি আসলে একটু লাজুক প্রকৃতির। বেশি ভিড়ে আমি অস্বস্তিবোধ করি। তার চেয়ে নিজের ঘরে গানবাজনায় ডুবে থাকা, ঘনিষ্ঠ লোকজনের সঙ্গই বেশি পছন্দ করি। আজকেই শুধু নয়, যখন আমি দুবেলা রেকর্ডিং করেছি, সেই ব্যস্ততার দিনেও রিহার্সাল এবং রেকর্ডিং শেষ করেই তড়িঘড়ি বাড়ি ফিরে স্বস্তি পেতাম। সিনেমায় যাদের জন্য গান গেয়েছি . তাদের সঙ্গেও আমার তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। এমনকি সুচিত্রা সেন, যার সঙ্গে আমার নামটা বেশি ওঠে, ওঁর সঙ্গেও আমার তেমন যোগাযোগ ছিল না। ফোনে মাঝেমধ্যে কথা হত। ভরত মহারাজের সঙ্গে একবার দেখা করতে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল সুচিত্রা সেন। অনেকবার ওর বাড়িতে যেতে বলেছে কিন্তু যাওয়া হয়ে ওঠেনি। নায়িকা হিসেবে সুচিত্রা সেন অসাধারণ, কিন্তু আমি অন্য নায়িকাদের জন্যও বহু গান গেয়েছি, এবং তা কোনও অংশে কম জনপ্রিয় হয়নি।'

মিডিয়াকে এড়িয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য সরল হলেও তাতে তির্যক ইঙ্গিত আছে—ক্রমাগত মিডিয়াকে ব্যবহার করে নিজের প্রচারে আমার আগ্রহ নেই। নিজের কথা সাতকাহন করে বলাটাও পছন্দ নয় আমার। পুরনো দিনের লোক আমরা ফলে আজকের এই 'নিজের পাবলিসিটি নিজে করো' যুগের পক্ষে বোধহয় খানিকটা বেমানান। জীবনভর গানটাকেই ভাল করে গাইবার চেষ্টা করে গেছি, অন্যদিকে তাকাবার তেমন ফুরসৎ পাইনি। আজকের যা বলার, কথার বদলে গানেই বলতে চাই।' এই গান শোনানোর এক প্রত্যক্ষ ধারা, জলসায় গাইবার ব্যাপারে আগ্রহ থাকলেও আসরে ক্রমশ দুর্লভ সন্ধ্যা, ফলে শ্রোতার প্রত্যাশার পারদ চড়তে থাকে 'আসরে গাইতে ভালই লাগে, তবে ডাক পেলেই দৌড়োদৌড়ি করে নিয়মিত ফাংশন করাটা আমার পছন্দ নয়। খুব বেছে বেছে অনুষ্ঠান করি। বছরে একটা-দুটো, কখনও তাও করা হয়ে ওঠে না। সবাই জানে এটা। অনেকদিন আগে একবার এক ফাংশনের অর্গানাইজার হেমন্তদাকে গাইবার জন্য ঠিক করে বলেছিলেন, আপনি যদি সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে একটু বলে দেন এই অনুষ্ঠানে গাইবার জন্য। আমরা বললে যদি রাজি না হন, আপনি বললে নিশ্চয়ই না বলতে পারবেন না। হেমন্তদা আমাকে অনুরোধ জানানো তো দূরের কথা, নিজেই বলে দিয়েছিলেন আমি সন্ধ্যাকে বলতে পারব না, ও গত মাসে একটা ফাংশনে গেয়েছে আমি জানি এখন কিছুতেই গাইবে না—তোমরা অন্য কাউকে বলো।'

অনুরাগীদের আবদার, মিডিয়া বা পাবলিক পারফরম্যান্স এড়িয়ে যাওয়া নিয়ে যদি কিছু অপ্রাপ্তি থাকে তা অতি তুচ্ছ, কারণ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় মানেই সুররসিকদের কাছে প্রাপ্তির উৎসব, তিনি বাংলা গানে এক স্তম্ভস্বরূপ। বহু সোনালি ফসল তিনি তুলে দিয়েছেন গানের গোলায়, সমৃদ্ধ করেছেন ঐতিহ্য, তিনি আমাদের অহঙ্কার। অনেক দিয়েছেন তিনি, তুলনায় তাঁকে দেওয়ার ব্যাপারেই বরং কার্পণ্য দেখিয়েছি আমরা।

বড়ে গুলাম আলি খান সন্ধ্যাকে বলেছিলেন আল্লাহ তোকে বহুৎ দোয়া দিয়েছে। ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট কিশোরী সন্ধ্যা তখন ঢাকুরিয়ায় বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে কাননবালা বা শৈল দেবীর গান গুনগুন করতেন। সেদিন থেকে আজ সাত দশক ধরে সঙ্গীতে আত্মসমর্পিত সন্ধ্যা ক্রমাগত নিজেকে

এইখানেই সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের একটা বড় জোরের জায়গা—তার হিমোগ্লোবিনে বাংলা ভাষা বাংলা গান—বাংলার ঘ্রাণ। তিনি বাংলার নিজস্ব সম্পদ

দিয়েছেন উৎকর্ষের ঠিকানা। তাঁর সেই উজ্জ্বল উদ্ধারই শিল্পী সম্পর্কে সার কথা।

বারো বছর বয়সে রেডিওর গল্পদাদুর আসরে প্রথম গান (অজয় ভট্টাচার্যর লেখা 'যদি বা ফুরালো গান') গেয়ে পাঁচ টাকা পারিশ্রমিক পাওয়া থেকে বা চোদ্দো বছর বয়সে এইচএমভির প্রথম রেকর্ডের গান গাওয়া (গিরীন চক্রবর্তীর কথা ও সুরে, তুমি ফিরায়ে দিয়েছ যারে এবং তোমারও আকাশে ঝিলমিল করে চাঁদের আলো) অথবা পনেরো বছরে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে 'গীতশ্রী' খেতাব অর্জন কিংবা সতেরো বছর বয়সে রাইচাঁদ বড়ালের সুরে প্রথম প্লে-ব্যাক (আনজান গড় ছবিতে) করা থেকে পাতিয়ালা ঘরানার হিমালয় বড়ে গোলাম আলি খানের শিষ্যত্ব গ্রহণ, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্মেলনে অংশগ্রহণ, বাংলা গানে সম্রাজ্ঞীর সিংহাসন অর্জন—ধারাবাহিক উত্তরণের এইসব কথামালা নিজেই লিখেছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। সেখানে তেমন কোনও রহস্য নেই, রহস্য তাঁর গানে। যিনি গাইছেন 'গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু', 'ঘুম ঘুম চাঁদ', 'এ শুধু গানের দিন', বা 'মধুমালতী' তাঁর কণ্ঠেই কী মধুর, 'মধুর মধুর বংশী বাজে', 'থৈ থৈ শাওন এল ওই'। যিনি 'উজ্জ্বল একঝাঁক পায়রা' গানে উজ্জীবনের মেজাজ আনেন তিনিই চেনেন 'কৌন তরহাসে' গানের ঠুমরি চালের মায়াজাল। 'বাজবন্ধ খুলে খুলে যায়' শব্দমালাকে যিনি সূক্ষ্ম অলঙ্কারে সাজান তিনিই নিরাভরণ সৌন্দর্য এঁকে দেন, রং দিতে পারেন কমললতার কীর্তনাঙ্গের গানে বা শ্রীরাধার অভিমানী অনুভবে। 'মায়াবতী মেঘে এল তন্দ্রা' গানের সুরবিহারে যিনি ঝরনার মতো স্বচ্ছন্দ, তিনিই ধ্যানী হয়ে ওঠেন 'সমুখে শান্তি পারাবার' মন্ত্র উচ্চারণে। যিনি 'তারা ঝিলমিল স্বপ্নের মিছিল' গানের চপলতা কণ্ঠে ধারণ করেন স্বচ্ছন্দে, তিনিই হয়ে ওঠেন এক মগ্নসত্তা 'পরানের মাঝে পিয়ার বসতি, তবু হিয়া মোর জ্বলে' গানে। 'বক বকম বকম পায়রা'র ডানা মেলার পাশাপাশি তিনি অনায়াসে সঙ্গীতে নিবেদন করেন অঞ্জলি, 'হরে কৃষ্ণ নাম বলো' গানে যিনি আটপৌরে সহজিয়া তিনিই 'বাঁধো ঝুলনা' বা 'চম্পা চামেলী গোলাপের বাগে'তে জটিল সুরবিহারী। 'ওরে ও বিজন রাতের পাখি' আর 'আমাদের ছুটি ছুটি' গানের দূরত্ব একলহমায় ঘুঁচে যায় সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠমহিমায়। এই স্বর্ণকণ্ঠটি রাইচাঁদ বড়াল থেকে সুমন চট্টোপাধ্যায়—এই দীর্ঘ পরিক্রমায় সুরের ক্রমিক বিবর্তনের দলিল হয়ে আছে। এই অবকাশে সন্ধ্যাকণ্ঠ নিয়ে সবচেয়ে ফলপ্রসূ নিরীক্ষার কৃতিত্ব রবীন চট্টোপাধ্যায়ের, পরবর্তী নামটি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের। এছাড়া সলিল চৌধুরি, নচিকেতা ঘোষ থেকে পবিত্র চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত অনেকেই নানা বাঁক এনেছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের উত্থানের রেখাচিত্রে।

অনুপম ঘটকের সুরে 'অগ্নিপরীক্ষার' (১৯৫৪) গান সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে যে উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিল, রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে 'পথে হল দেরী' (১৯৫৭) যে সিংহাসন পেতে দিয়েছিল, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সুরে 'জয়জয়ন্তী' (১৯৭২) ছবির গানেও সন্ধ্যার সেই মহিমাই সোচ্চার। পাঁচ এবং ছয়ের দশকে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ছিলেন বাংলা ছবির গানে ছবিসংবাদী সম্রাজ্ঞী। পাশাপাশি অনেক কুশলী গায়িকা ছিলেন। আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা দত্তর মতো অনেকেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ছায়াছবির গানে মাধুরী ছড়িয়েছেন, কিন্তু সব গাছ ছাড়িয়ে জেগে ছিল সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের বিজয় মাস্তুল এবং তাঁর রাজকীয় বিচরণের মহিমা। এক অনন্য স্টাইলের কাণ্ডারী হয়ে উঠেছিলেন তিনি। ছয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে বাংলা গানে শোনা যায়-দুই মারাঠি ভগিনীর কণ্ঠধ্বনি। প্রধানত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুধীন দাশগুপ্ত এবং সলিল চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা গানের ভূখণ্ডে সাম্রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শিরোনাম লতা মঙ্গেশকর এবং আশা ভোঁসলে। ফলে সত্তরের দশক থেকে চালচিত্র ক্রমশ পাল্টে যেতে থাকে।

এর ঠিক বিপরীত সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছিল সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের প্লে-ব্যাক জীবনের প্রথম পর্বেই। উনিশশো আটচল্লিশের 'আনজান গড়', সন্ধ্যার প্রথম প্লে-ব্যাক করা ছবিটি ছিল দ্বিভাষিক। অনিবার্যভাবেই সন্ধ্যাকে হিন্দি ভার্সানের জন্যও গাইতে হয়েছিল। ফলে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের হিন্দি সিনেমায় প্রথম গান 'হা হা হসকে জিয়ে'—বাংলা ছবিতে আত্মপ্রকাশের সঙ্গেই ঘটেছিল। এর দু'বছর পরে শচীনদেব বর্মন সন্ধ্যাকে হিন্দি ছবিতে প্লে-ব্যাক করাবার জন্য ডেকে নেন বোম্বাইয়ে। শচীনকর্তার আহ্বানে বোম্বাই পাড়ি দিলেও, সেখানে সন্ধ্যার প্রথম গান অনিল বিশ্বাসের সঙ্গীত পরিচালনায় 'তারানা' ছবিতে। পরে শচীনদেবের সুরে 'সাজ' এবং 'সজা' ছবিতে প্লে-ব্যাক করেছেন সন্ধ্যা। পাশাপাশি মদনমোহনের সুরে 'জঙ্গলমঙ্গল', খৈয়ামের সুরে 'ফুটপাথ' ছাড়াও 'ফরেব', 'ক্যাইসে ভুলুঁ', 'চিমনি কি ধুয়াঁ', 'ঘরানা', 'জাগতে রহো', 'টুটে সপনে', 'পহেলা আদমী', 'মনোহর', 'মেঘদূত', 'মহাকাল', 'শ্যামজী কি মায়া', 'লাল কি পগ', 'শমনীর'—এমন বেশ কয়েকটি হিন্দি ছবিতে প্লে-ব্যাক করেছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

তবে বোম্বাই প্রসঙ্গ উঠলে শিল্পী বলেন—'আমার একদম ভাল লাগেনি', আমার ভীষণ মন কেমন করত কলকাতার জন্য। এখান থেকে কয়েকজন সঙ্গীত পরিচালকও চিঠি দিয়ে ডেকেছিলেন। আমি কোনওদিন বম্বে যাওয়ার স্বপ্ন দেখিনি। বোম্বেতে গিয়ে গান করব এমন ভাবনাই ছিল না তাই কোনও আক্ষেপেরও প্রশ্ন ওঠে না। আমি এই নিজের জায়গায় এই বাংলার জল হাওয়ায় বাংলা ভাষার ভেতর ভীষণ খুশি।' এইখানেই সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের একটা বড় জোরের জায়গা— তার হিমোগ্লোবিনে বাংলা ভাষা, বাংলা গান—বাংলার ঘ্রাণ। তিনি বাংলার নিজস্ব সম্পদ। লতার সঙ্গে তাঁকে তুলনা করে দু'জনের মধ্যে দ্বন্দ্বমূলক কিছু প্রচার একদা প্রশ্রয় পেয়েছিল গুজবপ্রেমীদের কাছে। কিন্তু দুজনের কেউই এ ব্যাপারে কোনও সূত্র দিতে পারেননি। বরং পরস্পরের সঙ্গে সখ্যতার কথাই বলেছেন। বোম্বাইয়ে সন্ধ্যা প্রথম গানটি গেয়েছিলেন লতার সঙ্গে ডুয়েট 'বোল পাপিহা বোল রে'। বোম্বাই প্রবাসকালে দুই কিংবদন্তীর বেশ বন্ধুত্বের সম্পর্কই গড়ে উঠেছিল। লতার পেশাদারী ব্যস্ততা এবং সন্ধ্যার স্বভাব ঔদাসীন্য ক্রমশ দূরত্ব বাড়িয়েছে। দুজনের কণ্ঠস্বরের পার্থক্য, গায়নভঙ্গির তফাৎ মেজাজ এবং স্টাইল কোনওরকম তুলনাকে প্রশ্রয় দেয় না।

সেদিনের গান আজও লোকে শুনছে, আজকের গান দুদিনেই ভুলে যাচ্ছে

লতা এবং আশার বাণিজ্যিক সাফল্যে বাংলা গানের আকাশ অন্য শিল্পীদের ডানা মেলার ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ সঙ্কীর্ণ হয়েছে সন্দেহ নেই তবে তাতে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গানবাহারে আসেনি কোনও ভাটার টান। কারণ ছবির গানের পাশাপাশি প্রায় ছ'দশক ধরে বেসিক বাংলা গানের এক মহার্ঘ্য ভাণ্ডার গড়ে তুলেছেন তিনি। এই ধারায় তিনি ক্রমাগত নিজেকে আধুনিক করে তুলেছেন এবং নতুন শতাব্দীতেও তিনি বাংলা গানের বন্ধুদের খবর নিতে এসেছেন। ক্রমাগত পালটেছেন তাঁর লিরিকের শরীর এবং সেক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন শ্যামল গুপ্ত। সুর ও বাণীর দাম্পত্য এক্ষেত্রে ভীষণ কার্যকরী হয়েছে। সেইসঙ্গে রক্ষণশীলতা পেরিয়ে নতুন প্রজন্মের সুরকারের রচনাও অনায়াসে কণ্ঠে নিয়েছেন সন্ধ্যা। একাত্তর বছর বয়সেও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় উপহার দিয়েছেন পুজোর নতুন গান—বিস্ময়কর। তবে ইতিমধ্যে গানবাজারে ঘটে গেছে ব্যাপক পালাবদল। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের মতো মগ্ন সুরসাধিকার পক্ষে এই নতুন সিস্টেমে একাত্ম হওয়ার সুযোগ কমে গেছে, অতীতের সঙ্গে এসেছে তুলনা—'আকাশ আর পাতালের তফাত হয়ে গেছে গানবাজনার পরিবেশে। সেদিন এক একটা গান কীভাবে তৈরি হত, কত যত্ন করে শেখাতেন সঙ্গীত পরিচালকেরা। শিল্পীরা নিজেদের উজাড় করে দিতেন। আজকের প্রজন্মে কত ভাল শিল্পী রয়েছে কিন্তু তারা এসব সুযোগই পেল না। অনেকেই আফশোস করে। আজকের সবই তো রেডিমেড, তাই গানের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সুযোগই পাচ্ছেন না শিল্পীরা। ফলে সেদিনের গান আজও লোকে শুনছে, আজকের গান দুদিনেই ভুলে যাচ্ছে। এইসব দেখলে বড় কষ্ট হয়। আমাদের সময় রিহার্সালই ছিল এক একটা ওয়ার্কশপ। কম্পোজার গান তোলাতে বসে হয়তো, একটা বেনারসী ঠুমরি ধরলেন, তা থেকে একটু অলঙ্কার গানে যোগ করে দিলেন। কম্পোজিশন নিয়ে কালচার আড্ডায় আমরা টিউনড হয়ে যেতাম। মিউজিক ডিরেক্টররা নানাভাবে শিল্পীকে প্রেরণা দিতেন। ইদানীং দেখি সঙ্গীত পরিচালকেরা ক্যাসেট পাঠিয়ে বলেন—গানটা তুলে নেবেন। এভাবে গান হয়? আমি অন্তত এভাবে কাজ করতে রাজি নই—এরকম গোঁজামিল দেওয়া কাজ। আমি সুরকারকে বলি আমার সঙ্গে বসতে হবে। তিনি কী ভাবছেন গানটা নিয়ে, আমার কাছে কী চাইছেন, আমি সেটা করতে পারছি কি না এসব বোঝাপড়া না হলে ভাল গান হবে কী করে? আজকাল তো শুনি স্টুডিওতেই গান তুলে আগে থেকে তৈরি ট্র্যাকে গেয়ে দিচ্ছে শিল্পীরা। ডুয়েট গানের রেকর্ডিংয়ে নাকি দু'জন শিল্পীর দেখাই হচ্ছে না। এমন চটজলদি দায়সারা কাজ চটজলদিই হারিয়ে যায়। এর সঙ্গে তাল মেলানো সম্ভব নয় আমার পক্ষে।' আজকের রিমেক-রিমিক্স-মিউজিক ভিডিও জমানায় বেমানান সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের মতো কমিটেড শিল্পী। ইচ্ছা নির্বাসন তাঁকে এইসব উপদ্রব থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই বয়সেও তাঁর নাভিমূল থেকে উঠে আসে স্বর, অস্তিত্ব থেকে উঠে আসে গান। তাই হালফিলের স্কাইস্ক্র্যাপারের ভিড়ে তিনি এলিগ্যান্ট স্থাপত্যের মতো রয়ে গেছেন—'গানবাজনা নিয়ে ব্যবসা আগেও ছিল, কিন্তু শিল্পবোধ-রীতিনীতি বিসর্জন দিয়ে এমন নির্লজ্জ ব্যবসা ছিল না। যে কোনও রকমে বাজার ধরাই উদ্দেশ্য এখন। রিমেক যারা করান তাদের জানা দরকার একজন শিল্পী তার দীর্ঘদিনের শিক্ষা, নিজস্ব ভাবনাচিন্তা সঙ্গীত পরিচালকের কাছে নিখুঁতভাবে তুলে নেওয়া টেকনিক—সব মিলিয়েই তৈরি করেন বৈশিষ্ট্য বা স্টাইল। হেমন্তবাবুর স্টাইল, মান্নাবাবুর স্টাইল, মানবদার স্টাইল বা অখিলবন্ধু ঘোষের স্টাইল অনেক মূল্য দিয়ে অর্জন করা। যে কেউ ইচ্ছে হলেই সবার সব বৈশিষ্ট্য রাতারাতি রপ্ত করে নেবে, এতই সহজ ব্যাপার? একজনই একসঙ্গে হেমন্ত-মান্না দে-মানবেন্দ্র-সতীনাথ, ব্যাপারটা আশ্চর্য নয় কি? আর রিমিক্স তো গানের ওপর অত্যাচার। অবিচার আসল গানের শিল্পীদের ওপরেও। আসল গানটার শিল্পীর কোনও স্বীকৃতি নেই। অর্থনৈতিকভাবেও তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন। কিছু গান ব্যবসায়ী মুনাফা লুটছে। এতে গানের অন্তত কোনও মঙ্গল নেই। তাছাড়া শ্রোতাদের রুচি গড়ে দেওয়াটাও তো আমাদের কাজ। শ্রোতারা তো নকলটাকেই আসল বলে ধরে নিয়ে ভুল বুঝছে।

কোনওরকমে কিছু গান রেকর্ড করে মডেল-টডেল নিয়ে নাচানাচি করে একটা মিউজিক ভিডিও তৈরি করে ফেলাও হাল ফ্যাশন হয়েছে। উত্তম-সুচিত্রার জমজমাট প্রেমের ছবিতেও গানের দৃশ্যে বড়জোর একে অন্যের হাত ধরত, শেষ দৃশ্যে একটা আলিঙ্গন। এখন দেখি নায়িকাকে পাঁজাকোলা করে দৌড়চ্ছে নায়ক, সেইসঙ্গে গানও গাইছে। পোশাক বা আচরণে রুচির বালাই নেই, পরিবারের সঙ্গে বসে দেখা যায় না। এজন্যই আমি দীর্ঘদিনের সাথী রেডিওর প্রেমে এখনও মজে আছি। আমি নিজে মিউজিক ভিডিও'র ব্যাপারে একেবারেই আগ্রহী নই। গ্রামোফোন কোম্পানি বহুবার ভিডিও শ্যুটিংয়ের জন্য বলেছে আমি প্রতিবারই আপত্তি করেছি। ওরকম মাঠে ঘাটে বাগানে গাছ ঘুরে গান গাইতে আমি পারব না। গানের কথা সুর গায়কী দিয়ে যদি শ্রোতাকে আকর্ষণ করা না যায়, সে গান অর্থহীন। ওরা বলেছিল টিভি পাবলিসিটির জন্য এটা দরকার, আপনি যে এখনও নতুন গান গাইছেন এটা চোখে দেখলে শ্রোতারা উৎসাহী হবে। ওদের কথা শুনে আমি রাজি হয়েছিলাম, তবে শুধু আমার গানের রেকর্ডিংয়ের ছবি তুলতে।'

বেসিক গান গাইবার আগ্রহ এখনও নিভে যায়নি সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কিন্তু সিনেমার হাল হকিকৎ দেখে তিনি হতাশ। বছর পাঁচেক আগে বাংলা ছবির জন্য শেষ গান গেয়েছেন সন্ধ্যা, 'ঋণমুক্তি' এবং 'স্ত্রীর মর্যাদা' ছবির জন্য, কিন্তু তার আগে রেকর্ড করা বহু গান হারিয়ে গেছে—'আশি বা নব্বইয়ের দশকেও আমি মাঝেমধ্যেই সিনেমার জন্য গান রেকর্ড করেছি। অনেক ছবির মহরৎ হত গান রেকর্ডিং-এর মধ্য দিয়ে, তো আমি সে ছবির জন্য যথারীতি গান গেয়েছি—কখনও একটা কখনও বা দুটো গান কিন্তু তারপর আর সে গানের হদিশ নেই। দু-একবার আমি স্টুডিওর রেকর্ডিস্টদের কাছে জানতে চেয়েছি অমুক গানটার কী অবস্থা? ওরা বলেছে দিদি গান তো আছে, কিন্তু ওরা স্টুডিওর টাকাও পেমেন্ট করে না, গান নিয়েও যায় না। এরপর তো ও গান মুছে যাবে বা পরে খুঁজেই পাব না। এই হল অবস্থা—গান রেকর্ড হলেও ছবির কাজ ঝুলে থেকেছে বা বন্ধ হয়ে গেছে। এমন অনেক গান হয়েছে—বাইরের লোক তো এসব জানে না। এর মাঝে কিছুদিন গেছে যখন ঠুমরি চালের গানে আমি অভ্যস্ত বলে বাঈজিদের গান হলেই আমার ডাক পড়ত। এসব এই বয়সে আর ভাল লাগে না।

স্বামী শ্যামল গুপ্ত-র সঙ্গে

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে যে কোনও আলোচনাই শ্যামল গুপ্তর প্রসঙ্গ ছাড়া অসম্পূর্ণ। যে বছর সন্ধ্যা প্রথম প্লে-ব্যাক করেন সে বছরই 'অভিমান' ছবিতে প্লে-ব্যাক করার সূত্রে ওই ছবির একজন গীতিকার শ্যামল গুপ্তর সঙ্গে প্রথম আলাপ। দীর্ঘ আঠারো বছর পর ছেষট্টি সালে দুজনের বিয়ে এবং একমাত্র সন্তান কন্যা ঝিনুকের জন্ম। চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে শ্যামল গুপ্ত একই সঙ্গে স্বর্ণপ্রসবিনী কলম এবং পারিবারিক সমস্যা সামলেছেন। সাংসারিক ব্যাপারে আপাত উদাসীন স্ত্রীকে বহির্জগতের আঁচ থেকে রক্ষা করেছেন এবং এজন্য তাঁকে বিস্তর নিন্দেমন্দও সইতে হয়েছে।

কিংবদন্তী স্ত্রী তাঁর গুণী স্বামী সম্পর্কে বলেন 'শ্যামবাবু আমাকে হিমালয়ের মতো বাইরের ঝড়ঝাপটা থেকে আড়াল করেন। গানের ব্যাপারে তো সাহায্য পাই-ই, পঞ্চাশ বছর আগের নির্ভুল তথ্য উনি অবলীলায় তুলে আনতে পারেন। ওর বাইরের একটা আপাত কঠিন বর্ম আছে, সেটা পেরলে পাওয়া যায় একজন যথার্থ শিল্পীমনের রসিক বিচক্ষণ মানুষকে। আমার ওপর কোনও সিদ্ধান্তই উনি চাপান না। তবু কারও হয়তো ওঁর ব্যবহার 'অস্বাভাবিক' লাগতে পারে কিন্তু উনি গোটা ব্যাপারটা ওভাবে ট্যাকল্ করেন বলেই আমি 'স্বাভাবিক' জীবনযাপন করতে পারি। নিজের মধ্যে, গানবাজনার মধ্যে নিশ্চিন্তে ডুব দিতে পারি।'

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের চোখে রিয়্যাল হিরো, ফলে তিনি ধারণ করেন অন্তরের দৃঢ়তা। অন্যদিকে মাদার টেরেজার ভক্তও তিনি, তাই তাঁর অন্তর থেকে ফুটে ওঠে স্নেহময়ী মাতৃরূপ। দীর্ঘ সুরেলা সফরে অনেক পেয়েছেন তিনি—এটা যেমন সত্যি অন্যদিকে তাঁকে অনেককিছুই আমরা দিতে পারিনি। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের মতো কিংবদন্তীকে আজও কোনও রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত করার উদ্যোগ হয়নি, দেওয়া হয়নি উচ্চ মর্যাদার সংবর্ধনা। যদিও শিল্পী বলেন 'পুরস্কারের স্বীকৃতি পাওয়া নিশ্চয়ই আনন্দের কিন্তু আমি ওসব নিয়ে ভাবি না। জীবনে আঘাত যা পেয়েছি তা নিয়েও আমার ক্ষোভ নেই কোনও। ভালবেসে যে গান গেয়েছি তা আজও যে মানুষ শুনছে—এটাই তো শিল্পীজীবনের পরম প্রাপ্তি। শিল্পীর সঙ্গীত জীবনের হীরক জয়ন্তী বর্ষ চলে গেল সবার অলক্ষে। এমনকী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের জীবনের পঁচাত্তর বর্ষপূর্তির মতো গৌরবময় মাইলফলককে স্মরণীয় করে রাখতে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হল না। প্রকাশিত হল না শ্রুতির আড়ালে চলে যাওয়া তাঁর অমরগীতির কোনও সঙ্কলন। বোধহয় রাখা হয়নি সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কোনও অডিও ভিস্যুয়াল নথিও।

ছিয়াত্তরে পা দিয়েছেন শিল্পী। স্বভাবতই শারীরিক সমস্যা বিব্রত করে মাঝেমধ্যেই। তবু তার ভেতরেই শিল্পী যেমন গানে গানে আত্মনিবেদনে মগ্ন হন, তেমনই ছাদে তৈরি বাগিচায় ফুল-প্রজাপতিদের সঙ্গে মেলান ফ্রিকোয়েন্সি।

হয়তো অনাগত দিনে একটি নতুন গানের অ্যালবাম অভাবনীয় উপহার হিসেবে পেয়ে যাব আমরা। হয়তো কোনও আসরে গানের রামধনু ফুটিয়ে তুলবেন, তেমন দিনের প্রতীক্ষায় বরং আমরা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের চিরকালীন গানের কাছেই কান পাতি।

বহুকাল আগে প্রেমিক শ্যামল গুপ্ত, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন 'আমি এত যে তোমায় ভালবেসেছি'। সে গান মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে পেটেন্ট প্রেমের গান হয়ে গেছে। প্রায় বছর কুড়ি আগে পুজোর অ্যালবামে শ্যামল গুপ্তই তাঁর কিংবদন্তী স্ত্রীর মনের কথাটি লিখেছিলেন, যা সন্ধ্যাকণ্ঠে হয়ে আছে শিল্পীর জীবনদর্শন—

যদি সত্যিই আমি গান ভালবেসে থাকি
পৃথিবী তোমায় যাই জানিয়ে
আমার গানেই আমি থাকবো বেঁচে
মরণকে হার মানিয়ে।

ছবি : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোনা চৌধুরি

দিদির সঙ্গীত জীবনের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে

বড়দিদি

ছেলেবেলায় ভেবেছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় হবেন। নকল করে গাইতেন তাঁর গান। বড় হয়ে তাঁকেই পেলেন বড়দিদি হিসেবে। পিছন ফিরে দেখলেন ছোটবোন বনশ্রী সেনগুপ্ত.

সেই প্রথম আলাপেই উনি সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় থেকে আমার কাছে সন্ধ্যাদি হয়ে গেলেন। ওঁর সঙ্গে বিভিন্ন জলসায় বড় একটা দেখা হত না। কারণ দিদি খুব চুজি ছিলেন

পাঁচের দশক তখন শেষ হব হব। সেসময় বিনোদনের দুনিয়ায় রেডিওর একচেটিয়া আধিপত্য। ডিভিডি প্লেয়ার, আইপড তো দূরস্থান, দূরদর্শনও তখন মধ্যবিত্ত বাঙালির কাছে কল্পবিজ্ঞানের গল্পকথা। অবসর কাটানোর জন্য রেডিওই আমাদের ফ্রেন্ড, ফিলোজফার অ্যান্ড গাইড। আকাশবাণীর 'অনুরোধের আসর'-এর টিআরপি তখন কলকাতার সঙ্গে সঙ্গে জেলাতেও ক্রমশ উর্ধ্বগামী।

তখন তো এখনকার মতো স্লিম অ্যান্ড ট্রিম-এর যুগ আসেনি। হুগলির চুঁচুড়ায় আমাদের বাড়ির দালানে রাখা থাকত ঢাউস রেডিও। আর তাকে ঘিরে আমাদের একান্নবর্তী পরিবারের সব সদস্য—তার মধ্যে আমাদের ভাইবোনের গ্রুপের মেম্বারই প্রায় জনা উনিশ। আমি তো অধীর আগ্রহে বসে থাকতাম—কখন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গান শুনব। তখন আমার প্রতিটি সন্ধ্যা ছিল সন্ধ্যাময়। ওঁর কিন্নরকণ্ঠের গান শুনে ওঁর ডাই-হার্ড ফ্যান হয়ে গেছিলাম। তখনও ওঁর ছবি পর্যন্ত দেখিনি। গান শুনতে শুনতেই স্বপ্ন দেখতাম—আমিও একদিন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় হব। কিশোরী বয়সে তো রীতিমতো ওঁকে অনুসরণ করতে শুরু করলাম। তখন এইচএমভি-র শারদ অর্ঘ্যে ওঁর ছবি দেখেছি। তাই গানের সঙ্গে সঙ্গে সাজপোশাকেও ওঁর প্রভাব পড়ল। ঠিক ওঁর মতো করে হাতখোঁপা বা দু'টো বিনুনি,পরনে হাল্কা রঙের তাঁতের শাড়ি—এটাই আমার কাছে ক্রমশ ফ্যাশন স্টেটমেন্ট হয়ে গেল। গানে না হতে পারি, দেখতে নয় ওঁর মতো হলাম—এটা ভেবেই ভালো লাগত

আমাদের বাড়িতে বেশ গানের চর্চা ছিল। আমার বাবা ছিলেন কবিরাজ। তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের খুব ভক্ত ছিলেন। বাবার নির্দেশ ছিল, আগে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ভালো করে শেখো, তারপর না হয় আধুনিক গানের চর্চা করবে। এদিকে আমি তো ঠিক করেই ফেলেছি যে গান করলে শুধু আধুনিক গানই করব—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের মতো। ওদিকে বাড়িতে বাবার কড়া ফতোয়া। এই পরিস্থিতিতে আমি কী করি?

সোমবার আর শুক্রবার বাবা চুঁচুড়া থেকে কলকাতায় রোগী দেখতে যেতেন। আমি সারা সপ্তাহে এই দু'টো দিনের জন্য অপেক্ষা করে থাকতাম। বাবা বেরিয়ে গেলেই হারমোনিয়াম নিয়ে বসে পড়তাম। সঙ্গে অন্যসব ভাইবোন। তারপর আমাদের সারা বাড়িটাই একটা অনুরোধের আসর। তখন আমার সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় হওয়া আটকায় কে?

আমরা যাতে বাবার কাছে ধরা না পড়ি;মা বাবাকে বলেছিলেন, তুমি বাড়িতে ঢোকার আগে ড্রাইভারকে হর্ন দিতে বলবে। আমরা তাহলে আগে থেকে দরজা খুলে রাখতে পারব। এতে তো আমাদের খুব সুবিধে হল। দূর থেকে বাবার গাড়ির হর্নের বিকট শব্দ শুনতে পেলেই নিমেষের মধ্যে তবলা, হারমোনিয়াম সব তুলে ফেলতাম।

কিন্তু শেষরক্ষা হল না। একদিন ঠিক ধরা পড়ে গেলাম। সেদিন বাবা বাড়ির চেম্বারে রোগী দেখছিলেন। আমি নিষেধাজ্ঞা ভুলে হঠাৎ খোলা গলায় মায়ামৃগ সিনেমার 'বকম বকম পায়রা' গানটা গেয়ে উঠেছি। অবধারিতভাবে সেটা বাবার কানে গেল। চেম্বার ছেড়ে বাবা ওপরে উঠে এলেন। আমি তো ভয়ে আধমরা। ওমা ! বাবা আমার গানের বেশ তারিফই করলেন। কিন্তু সঙ্গে সেই উপদেশ—আগে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তালিম সম্পূর্ণ হোক, তারপর অন্য কথা। বাবা চেয়েছিলেন নিজের হাতে আমাকে তৈরি করতে। কিন্তু বাবার সেই স্বপ্ন সত্যি হল না। আমার বিয়ের আগেই বাবা মারা যান।

ভয় ছিল, বিয়ের পর বোধহয় আমার গানবাজনা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু সেই আশঙ্কা তো সত্যি হলই না, বরং স্বামীর উৎসাহে আমি পেশাদার গানের জগতে পা রাখলাম। বকুলবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসবের বিজয়া সম্মিলনীতে গান করার সময় মৃণাল চক্রবর্তীর চোখে পড়ে গেলাম। উনি আমায় সুধীন দাশগুপ্তর কাছে গান শেখানোর জন্য নিয়ে গেলেন। এছাড়া বাণীচক্রেও গান শিখতে শুরু করলাম। সেইসঙ্গে বাড়তে লাগল জলসার সংখ্যা।

সেটা বোধহয় '৬৫ কি '৬৬ সাল হবে। সালকিয়া ব্যায়াম সমিতির অনুষ্ঠানে গান গাইতে গিয়েছি। ওখানে আমি ছাড়াও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় আর তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান গাওয়ার কথা। আমি তো একদম নবীন শিল্পী। অনুষ্ঠান শুরুর আগে গ্রিনরুমে বসে আছি। হঠাৎ উদ্যোক্তাদের একজন এসে বললেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি তো আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। উদ্যোক্তারা আমাকে কাছেই একটা বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানে উনি অপেক্ষা করছিলেন। স্বপ্নের গায়িকার সামনে দাঁড়িয়ে আমি তো উত্তেজনায় কাঁপছি। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় আমার গানের প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, 'তুমি গ্রিনরুমে বসে আছ কেন? অনুষ্ঠানের আগে ওখানে থাকলে গানে কনসেনট্রেট করা যায় না। চারদিকে নানারকম চেঁচামেচি, সিগারেট বিড়ির গন্ধ...ওর মধ্যে একদম বসবে না। একান্তই যদি অন্য কোথাও জায়গা না পাও, গাড়িতে বসে থাকবে। দেখবে, এতে মঞ্চে উঠে গান করতে সুবিধে হবে।' সেদিনের পর থেকে এই অ্যাডভাইস আমি সারাজীবন ফলো করে এসেছি।

সেই প্রথম আলাপেই উনি সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় থেকে আমার কাছে সন্ধ্যাদি হয়ে গেলেন। ওঁর সঙ্গে বিভিন্ন জলসায় বড় একটা দেখা হত না। কারণ দিদি খুব চুজি ছিলেন। যে কোনও অনুষ্ঠানে গান করতেন না। আগে শুনতেন, অনুষ্ঠানে অন্যান্য শিল্পীরা কে কে আসছেন, তারপর ঠিক করতেন উনি গান করবেন কি না। আর ওঁর সঙ্গে বাজিয়েরাও নির্দিষ্ট ছিলেন। আমরা জানতাম, সন্ধ্যাদি গান করলে তবলা বাজাবেন রাধাকান্ত নন্দী। দিদির গানের সঙ্গে ওঁর তবলার বোল যেন কথা বলত। এছাড়াও বেহালাবাদক ছিলেন সমীর শীল। আর বাঁশি বাজাতেন অলকনাথ দে।

একেই বেছে বেছে অনুষ্ঠান করতেন, তারওপর কোথাও খেয়াল বা ঠুমরি গাইবেন বলে ঠিক হলে তো আর কথাই নেই। উনি সেই অনুষ্ঠানের আগে ছ'মাস কোথাও গান করতেনই না। এরকমই ছিল ওঁর ডেডিকেশন।

এমন বড় মাপের শিল্পী যে এত ডাউন টু আর্থ হতে পারেন, সন্ধ্যাদি'কে না দেখলে বোঝা যায় না। কী অমায়িক ব্যবহার!জোরে কথা বলা একদম পছন্দ করেন না। আমাদের সবাইকেও ধীরে ধীরে কথা বলতে বলেন। দিদি সবসময় আমাদের শেখাতেন, কণ্ঠস্বর ঈশ্বরপ্রদত্ত সম্পদ। তাকে কেন

তুমি অবহেলা করবে? আর একটা জিনিসও সন্ধ্যাদি খুব পছন্দ করেন—কম কথা বলা। অকারণে হ্যা হ্যা করা সন্ধ্যাদি'র একেবারে না-পসন্দ। উনি মনে করেন, এতে গলারও যেমন বিশ্রাম হয়, তেমনি তোমার একটা সুন্দর ব্যক্তিত্বও গড়ে ওঠে।

মেপে কথা বলেন বলেই দিদিকে খুব রিজার্ভড মনে হয়। তবে একই সঙ্গে উনি অসম্ভব আন্তরিক। ওঁর লেক গার্ডেন্সের বাড়িতে প্রথমবার গিয়ে তো আমি অভিভূত। অত ব্যস্ততার মধ্যেও কী সুচারুভাবে সংসারের সব কাজ পরিচালনা করেন। সারা বাড়িতে কোথাও এককণা ধুলো নেই। দিদি বলেছিলেন, সারা দিনে গোটা বাড়িটা বারতিনেক মোছা হয়। এমনকী, আমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে দিদি ওঁর পরিচারিকাকে ডেকে বললেন, এখানে ধুলো জমে আছে। একটু ঝেড়ে দিয়ে যাও তো। ওঁর বাড়িতে যারা কাজ করেন তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগই অনেকদিন ধরে ওই বাড়িতে আছেন। কাজের লোকদের সঙ্গে উনি খুব সুন্দর করে কথা বলেন।

সন্ধ্যাদি ফল খেতে খুব ভালোবাসেন। ওঁর বাড়িতে ডাইনিং টেবিলের ওপর প্রচুর ফল রাখা থাকে। দিদি বলেন, মরসুমি ফল খেলে শরীর ভালো থাকে। সেইসঙ্গে গলারও উপকার। গানের গলা ঠিক রাখার জন্য দিদি খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে খুব সচেতন। ওঁর বাড়িতে উনি আমায় একটা নতুন জিনিস খাইয়েছিলেন। টক দই আর বিটনুন দিয়ে শশা কুচি মাখা। বললেন, এটাকে বলে রায়তা। সেই আমার জীবনে প্রথম রায়তা খাওয়া। সন্ধ্যা দি বলেছিলেন কখনও শশা শুধু মুখে খাবে না। তাতে গ্যাস হয়। সঙ্গে টক দই আর বিটনুন মিশিয়ে খাবে। দিদির বাড়িতে খুব বেশি বার যাইনি। কিন্তু যতবারই গেছি, এরকম উষ্ণ আন্তরিক ব্যবহার পেয়েছি।

একবার জন্মাষ্টমীতে দিদি আমাদের সবাইকে নেমন্তন্ন করেছেন। কী সুন্দর ওঁর ঠাকুরঘর। কাচের ঘরে নাড়ুগোপাল বসে আছেন। আমরা সবাই একসঙ্গে বসে ভোগ খেয়েছিলাম। সেইসঙ্গে তালের বড়া আর জিলিপি। ওঁর মেয়ের বিয়েতেও আমরা খুব আনন্দ করেছিলাম বিয়ের আসরেও কী সুন্দর ঠাণ্ডা মাথায় সবকিছু সামলিয়েছেন। কোনও টেনশন নেই। ধীরে সুস্থে মেয়ের মা হিসেবে সব দায়িত্ব পালন করে গেছেন। খাওয়ার সময় নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের খাওয়ালেন।

আমার বিয়ের আগে বাবা মারা গিয়েছিলেন বলে বিয়েতে সেরকম জাঁকজমক হয়নি। তাই বিয়ের পঁচিশ বছর পূর্তিতে বেশ জমকালো অনুষ্ঠান করেছিলাম। সব্বাইকে ডেকেছিলাম। সন্ধ্যাদিও এসেছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ ছিলেন। যাওয়ার সময় তো আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। সেদিনের আনন্দস্মৃতি চিরদিন মনে থাকবে।

প্রথাগতভাবে ওঁর কাছে গান না শিখলেও সন্ধ্যাদি আমার অন্যতম শিক্ষাগুরু। অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম দিদিকে একটা শাড়ি উপহার দেব। একদিন একটা পিওর সিল্ক শাড়ি নিয়ে ওঁর কাছে গেলাম। ভেবেছিলাম হয়তো রেগে যাবেন বা বিরক্ত হবেন কিন্তু সেসব কিছুই হল না। হেসে বললেন, 'এসব আবার কী দুষ্টুমি!' চিরকালই ওঁকে দেখেছি সাদা বা অফ হোয়াইট তাঁতের শাড়িতে। সঙ্গে গলায় মটর চেন আর কানে হিরে। এখন যখন নিজের জন্য শাড়ি কিনি, হাল্কা রঙের শাড়ি ছাড়া কিছু মনেই ধরে না। এভাবেই আমার মজ্জায় মজ্জায় মিশে গেছে সন্ধ্যাদি'র প্রভাব।

দিদির কথা কত বলব? আমি তখন লেক মার্কেটে থাকি। একদিন সন্ধেবেলা বেরিয়ে টুকটাক বাজার করছি। একজন

আমার বিয়ের রজতজয়ন্তী পূর্তিতে

এসে বললেন, দিদি আপনাকে ডাকছে। আমি তো অবাক কে আবার আমায় ডাকল? দেখি সন্ধ্যাদি গাড়ির কালো কাচ অল্প একটু নামিয়ে আমার দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছেন। ওঁর ড্রাইভারকে আমাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলেন। আমাকে গাড়িতে উঠিয়ে দিদি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে কী করছ?' আমি বললাম 'একটু টুকটাক বাজার করছি।' শুনে দিদি বললেন, 'ধরো, তোমার পাড়ায় একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে। সেখানে উদ্যোক্তারা তোমায় ডেকে এইভাবে পরিচয় করিয়ে দিলেন—বনশ্রী দি'কে আমরা রোজই দোকানবাজার করতে দেখি। সেটা তোমার ভাল লাগবে? নাকি যদি বলেন—বনশ্রীদি খুব ব্যস্ত। আমাদের সঙ্গে তো দেখাই হয় না, সেটা ভাল লাগবে? সবসময় একটা দূরত্ব বজায় রাখবে। তাহলে দেখবে লোকে তোমার কদর করছে। এটা সন্ধ্যাদি নিজের ক্ষেত্রেও সবসময় মেনেছেন। আর ঠিক এই জায়গাতেই ওঁর সঙ্গে আমি সুচিত্রা সেনের অদ্ভুত মিল খুঁজে পাই।

একবার কিন্তু দিদি আমায় বেশ চমকে দি ছর দশেক আগের কথা। মে মাসে আমার জন্মদি ন সকালে হঠাৎ দিদি আমার ফ্ল্যাটে এসে হাজির। আম একটা শাড়ি উপহার দিলেন। আমি তো ভাবতেই পারছি ম না দিদি আমার জন্মদিন মনে রেখেছেন। সেদিন দিদি বেশ খানিকক্ষণ আমার বাড়িতে ছিলেন। পুরো ফ্ল্যাটটা ঘুরে দেখলেন। ফ্ল্যাটের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দিদি তো খুব খুশি। বললেন, 'বাঃ সামনে দুটো বড় বড় গাছ, তোমরা তো খুব হাওয়া খাও।'

গানের ক্ষেত্রে দিদির কাছ থেকে কত খুঁটিনাটি যে শিখেছি, বলে শেষ করতে পারব না। সঞ্চারীর অংশ গাইবার সময় দিদি মুখটাকে মাইকের কাছে নিয়ে যেতেন। এতে নাকি ভাল এক্সপ্রেশন আসে। এছাড়া গানের মুড বুঝে টোন চেঞ্জ—এসব তো দিদির কাছেই শেখা। লাইট ক্ল্যাসিক্যাল, আনন্দের গান, দুঃখের গান—যে কোনও ইমোশনই সন্ধ্যাদি'র গানে অন্য মাত্রা পেত। সবাইকে যে কী স্নেহ করতেন উনি। আমি তো বলি, গানের সংসারে সন্ধ্যাদি আমার মা।

এবার ছোটবেলার একটা ঘটনা বলে গল্পের ঝাঁপি বন্ধ করব। সেবার দার্জিলিং বেড়াতে গেছি। আমার দাদার একটা অ্যাকোর্ডিয়ান ছিল। দার্জিলিঙের ম্যালে গাছতলায় বসে দাদা হঠাৎ 'পথে হল দেরি' সিনেমার 'এ শুধু গানের দিন, এ লগন গান শোনাবার' গানটার প্রিলিউডটা বাজাতে শুরু করেছে। আর আমিও গানটা ধরেছি। কিছুক্ষণ পর দেখি চারপাশে লোক জমতে শুরু করেছে। আমাদের ভাইবোনের যুগলবন্দি শ্রোতাদের খুব মনে ধরেছিল। এই ঘটনাটায় আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে খুব কনফিডেন্সও পেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, না, সিরিয়াসলি করলে গানটা আমার হবে।

গান করার সময় ছোটবেলায় ওঁকে নকল করতাম। কিন্তু পরে সুধীন দাশগুপ্ত, প্রবীর মজুমদার—এঁদের কাছে শিখতে গিয়ে বুঝলাম নিজের স্বকীয়তা ছাড়া শিল্পী হওয়া যায় না। তাঁদের কথা শুনেছি বলেই আজ এই জায়গায় আসতে পেরেছি। নইলে হয়তো সন্ধ্যাকণ্ঠী হয়েই থেকে যেতাম।

তবে আমার বনশ্রী সেনগুপ্ত হয়ে ওঠার পেছনে সন্ধ্যাদি'র প্রভাব আর আশীর্বাদ অনস্বীকার্য। সন্ধ্যাদি অসুস্থ হওয়ার পর আমার সঙ্গে এখন যোগাযোগ আগের থেকে অনেক ক্ষীণ। জানি না, রোববার-এ এই স্মৃতিচারণ সন্ধ্যাদি পড়বেন কি না! যদি অজান্তেই পড়ে ফেলেন, যদি আলগোছে মনে পড়ে যায়, আমাদের ফুল জল মেঘ বৃষ্টিদিনের দিবারাত্রির কাব্য, শ্রাবণসন্ধ্যার পর জেগে ও কী মিষ্টি ছিল সেই সকাল, সোনা ঝরছে, ঝ দিন—দিদির নিশ্চয়ই মনে পড়ে যাবে। গে গানগুলো।

অনুলিখন : অর্পিতা চৌধুরী

শ্রা

শ্রাবণ
সন্ধ্যা

সেই সন্ধ্যা

বুক ঢিপঢিপ, পা ঠকঠক, গলা শুকিয়ে কাঠ, সায়েন্সসিটি উপচে পড়া ভিড়—এমন সময় দিদি ডাকলেন ডুয়েট গাওয়ার জন্য।
শ্রীকান্ত আচার্য

দু'হাজার চারের মহালয়ার এক সন্ধে, আমার সঙ্গীতজীবনের বড় বিশিষ্ট ক্ষণ। সায়েন্সসিটি অডিটোরিয়াম সেদিন কানায় কানায় পরিপূর্ণ। তিলধারণের জায়গামাত্র নেই। উত্তেজনায় তখন আমার বুক ঢিপঢিপ করছে। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের মতো শিল্পীর সঙ্গে একই মঞ্চে সেই প্রথমবার ডুয়েট গাইব! ভাবতে ভাবতেই কেমন যেন ঘোর লেগে যাচ্ছে, পা তো প্রায় অবশ হয়ে গিয়েছে, হাঁটতে আর পারছি না।

অনুষ্ঠানের ফার্স্ট হাফ-এ ছিল সন্ধ্যাদির দশটা একক সঙ্গীত। আর সেকেন্ড হাফ-এ ছিল ডুয়েট। পালা করে আমার আর সৈকত—মানে সৈকত মিত্রের গান গাওয়ার কথা ছিল সন্ধ্যাদির সঙ্গে। হাফ টাইমের পর প্রথম তিনটে গান একা গাওয়ার পর চতুর্থ গানটা যখন গাইতে যাবেন—তখনই গোলটা বাধল। হঠাৎ দিদি আমাকে গান গাইতে ডাকলেন। আমি তখন প্রায় ঘেমে-নেয়ে একসা। নির্লিপ্তভাবে গিয়ে বসলাম দিদির পাশে। তখন তো আমার মাথায় আর কিছু নেই। ভাবলাম, বোধহয় আর গাইতে পারব না। কিন্তু তারপর যখন সন্ধ্যাদির চোখের দিকে তাকালাম—দেখলাম, উনি শুধু আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। সেই হাসির মধ্যে কী ছিল জানি না। শুধু মনে হল, আমি আর কোনওকিছুতেই ভয় পাব না। কারণ, পাশে দিদি আছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, সমস্ত টেনশন, নার্ভাসনেস—এক সেকেন্ডে উধাও। এই হলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। যাঁর সান্নিধ্য, আন্তরিকতা, ভালবাসা যেকোনও নিষ্প্রাণ বস্তুতেও প্রাণের সঞ্চার ঘটাতে পারে!

আমার মনে আছে, ওই অনুষ্ঠানের পরেরদিনই ভোরবেলার ফ্লাইটে আমেরিকা চলে যেতে হয়েছিল আমায়। ওখান থেকে ফেরার ঠিক চারদিন পর ফোন করে উনি আমার খোঁজখবর নিলেন। আক্ষেপ করলেন, সেদিনের অনুষ্ঠানে গান গেয়ে তিনি সন্তুষ্ট নন। তিনি নাকি তাঁর সেরাটুকু উজাড় করে দিতে পারেন নি! এরকমই সন্ধ্যাদি। গানবাজনাকে একটা মানুষ কতটা ভালবাসতে পারেন—সেটা একমাত্র দিদিকে দেখলেই বোঝা যায়। গানের প্রতি এতটা ডেডিকেশন—বোধহয় তাঁর মতন মানুষের পক্ষেই দেখানো সম্ভব! ওনার মতো একজন শিল্পী—চাইলে বছরে হাজারটা ফাংশন করতে পারতেন। কিন্তু না, করেন নি। তিনি এতটাই সংযমী ছিলেন, কারণ তিনি তো সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

ছোটবেলা থেকেই সন্ধ্যাদির গান শুনে বড় হয়েছি। ওনার গান যে আমায় কতটা টানে—তা বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তখন রেডিও শুনতাম নিয়মিত। আমার গানের কেরিয়ার রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে শুরু হলেও সব ধরনের গানই আমি শুনতাম। ওনার বেশিরভাগ গানই আমার রেডিওতে শোনা। সন্ধ্যাদি এমন একজন শিল্পী যিনি বাংলা বেসিক গান এবং ছবির গান—দুই ক্ষেত্রেই সমানভাবে সফল। তখন তো বাংলা ছবি মানেই উত্তম-সুচিত্রা, হেমন্ত-সন্ধ্যার যুগলবন্দি। ওনার গাওয়া, যে গানটা আমাদের প্রজন্মে সবচেয়ে বেশি সাড়া ফেলেছিল—সেই গান—'গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু'। তবে শুধু এটা নয়, সন্ধ্যাদির গাওয়া আরও অনেক গানই আমার পছন্দের।

গান গাওয়ার সুবাদে, ওনাকে খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। উনিশশো নিরানব্বই-এ। সঙ্গে গৌতমদা মানে গৌতম ঘোষকে নিয়ে গিয়েছিলাম আমি। এত বড় একজন শিল্পীর বাড়ি যাব ভেবে, ভয়ে একেবারে সিঁটিয়ে ছিলাম। ভেবেছিলাম, পাঁচ-দশ মিনিট বসব আর চলে আসব। কিন্তু ওনার বাড়িতে গেলে, উনি যে খাতিরযত্ন না করে

ছাড়েন না—তা আর কে জানত? এত আদরযত্ন পেয়েছিলাম যে সেটা আমার পক্ষে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ওনার কাছ থেকে যে এত ভালবাসা পাব সেটা কল্পনাও করতে পারিনি। আর একটা ব্যাপার হল, ওনার বাড়িতে গেলেই উনি আপনার সম্বন্ধে খুঁটিয়ে জেনে নেবেন। আমাদের গান নিয়েও খুঁটিনাটি প্রশ্ন করলেন। প্রায় আড়াই ঘণ্টা ছিলাম ওনার বাড়িতে। পরে অবশ্য আরও দু'তিনবার ওনার বাড়িতে গিয়েছিলাম।

আরও একটা ব্যাপারে আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। মহালয়ার দিন সায়েন্সসিটি অডিটোরিয়ামে সন্ধ্যাদির জন্য দর্শকদের অমন উন্মাদনা দেখে। মুম্বই, চেন্নাই, পুনে, দিল্লি থেকে সবাই এসেছে—শুধু এক ঝলক সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে দেখবে বলে! প্রতীক্ষা শুধু একটিবার গান শুনবে তাদের প্রিয় গায়িকার!

উনি তো সবসময়ই তাঁর চারপাশে একটা অদৃশ্য দেওয়াল তৈরি করে রাখতেন। নিজেকে 'ইজিলি' 'অ্যাভেলেবল' হতে দেননি কখনও। আসলে সংযমই তো মূলমন্ত্র! গানের সঙ্গে কখনও কোনও আপস করেন নি উনি। যখন ছবির গান করেছেন তখন একমাস আগে থেকে ক্লাসিক্যাল গাওয়া বন্ধ করে দিতেন। আবার যখন ক্লাসিক্যাল গাইতেন তখন ছবির গান থাকত এক্কেবারে বন্ধ। এমনটাই ছিল, তাঁর গানের প্রতি ডেডিকেশন।

উস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খাঁ-র অন্যতম প্রিয় ছাত্রী ছিলেন সন্ধ্যাদি। এ এক বিশাল স্বীকৃতি! খাঁ সাহেবকে ঈশ্বরের মতো দেখতেন উনি।

সবচেয়ে অবাক লাগে—ওনার নতুন কিছু তো আর পাওয়ার নেই। কিন্তু এখনও নিজেকে সবসময় সঙ্গীতের একনিষ্ঠ ছাত্রী ভাবেন। সবসময়ই তাঁর শেখার আগ্রহ। উনি বলতেন—'যে সঙ্গীত পরিচালকদের কাছে কাজ করেছি, তাঁকে গুরু মেনেছি। ওঁরা যদি এইভাবে হাতে ধরে না শেখাতেন, তাহলে কি গান গাইতে পারতাম?'—এই যে সবসময় একটা শেখার আগ্রহ, এরজন্যই কিন্তু উনি অনন্য।

সব ধরনের গান উনি শোনেন, ভালবাসেন। সব ধরনের গানে উনি সমান সাবলীল। উনি সবসময়ই নতুন সময়ের গান গাওয়ার চেষ্টা করেছেন। আপনারা জানলে অবাক হবেন—উনি বাড়ি থেকে বেরন না অথচ সমস্ত ধরনের গানের খোঁজখবর রাখেন। উনি একবার টিভিতে আমার একটা গানের প্রোগ্রাম দেখে খুব প্রশংসা করেছিলেন। বলেছিলেন, সবসময় চোখ খোলা রেখে গান গাইতে। আমার গান যে ওনার ভাল লেগেছে, সেটা উনি নির্দ্বিধায় বলেছেন আমাকে।

এই স্বীকৃতিটুকু বুকে নিয়েই রেওয়াজে বসব রোজ, গান গেয়ে যাব আরও অনেকদিন। এই প্রশংসাটুকু একজন মানুষকে সেই প্রেরণা জোগায়, দেখায় সেই স্বপ্ন—যা একজন গায়ককে সস্তা জনপ্রিয়তার উর্ধ্বে উঠে প্রকৃত শিল্পী হয়ে উঠতে সাহায্য করে।

অনুলিখন : রিংকা চক্রবর্তী

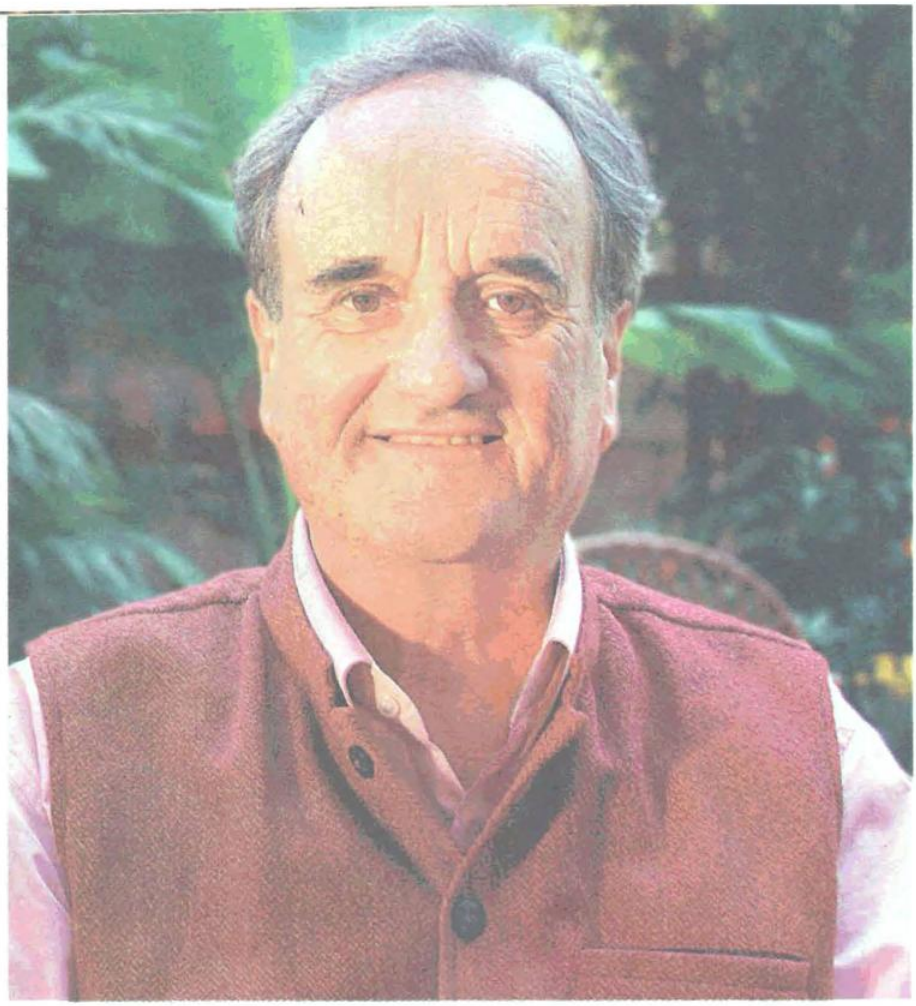

অনিঃশেষ পথচলার চিহ্ন

'Hindu tradition acknowledging that there can be many ways to God help Christians to question those of their beliefs which have led them to deny the validity of other faiths, and all too often the validity of other Christian traditons than their own'

–Mark Tully; *'India's Unending Journey.'*

মার্ক টুলি মানেই বিবিসি। আর বিবিস-র এই চিফ কমেনটেটারের দীর্ঘ ৪৩ বছরের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, ভারতবর্ষ কীভাবে তার দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তাধারায় বদল এনেছে তাই নিয়েই 'India's unending Journey.'। সম্প্রতি ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরিতে এই বইটি উদ্বোধন করলেন রাজ্যপাল গোপাল কৃষ্ণ গান্ধী।

১৯৩৫ সাল-এ, কলকাতায় মার্কের জন্ম। দশ বছর বয়সে চলে যান ব্রিটেনে। কলকাতাতে থাকাকালীন কড়া শাসনে মানুষ হয়েছেন। কেমব্রিজ কলেজ থেকে বেরিয়ে ঠিক করেন প্রিস্ট হবেন। ভর্তি হন লিংকন থিয়োলজিকাল কলেজে। মাত্র দুটো টার্মের পর বুঝতে পারেন এটি তাঁর কম্মো নয়। বিবিসিতে চাকরি নেন। ১৯৬৪ সালে চলে আসেন ভারতে তবে এবার দিল্লিতে, বিবিসির মুখ্য ধারাভাষ্যকার হয়ে।

সেই শুরু হল অনিঃশেষ ভারতভ্রমণ কাজের ফাঁকে লেখালেখির রসদ সংগ্রহের অবিরাম প্রয়াস।

আপনার জন্ম তো কলকাতাতে। সেই ছোটবেলার কলকাতাকে মনে পড়ে?

হ্যাঁ কলকাতাকে মনে পড়ে। তবে আরও বেশি করে মনে পড়ে ট্রেনে করে দার্জিলিং যাওয়ার কথা।

দশ বছর বয়সে আপনি ব্রিটেনে চলে যান। আপনি নিজে বলেছেন যে আপনার ঠাকুমা খুব কড়া শাসনে রেখেছিলেন আপনাদের। বলা যেতে পারে তিনি হিন্দুদের খানিকটা ঘৃণা করতেন। আপনার কোনও হিন্দু বন্ধু ছিল না?

(হাসলেন) আসলে আমার ঠাকুমা ভয় পেতেন পাছে আমরা হিন্দুদের সঙ্গে মিশে ক্রিশচিয়ানিটি ভুলে যাই। উনি হিন্দুদের ঠিক ঘৃণা করতেন না তবে 'লস অফ ক্রিশচিয়ানিটি'র একটা ভয় তার মধ্যে বাসা বেঁধেছিল। যদি আমি বদলে যাই তাই ছোটবেলায় আমি শুধু মাত্র ইংলিশ বাচ্চাদের সঙ্গেই খেলার অনুমতি পেতাম।

দীর্ঘ ৪৩ বছর কাটিয়ে দিলেন ভারতবর্ষে। চাকরি নিয়ে ভারতে আসাটা কি ইচ্ছা করে না জাস্ট কোয়েনসিডেন্স?

একেবারেই কোয়েনসিডেন্স।

কতগুলো ভারতীয় ভাষা শিখেছেন এই দীর্ঘ সাংবাদিকতার জীবনে?

(হেসে) আমি হিন্দি জানি। কিন্তু মজার বিষয় হল আমি হিন্দিতে কথা বললে এখানকার লোকে ইংরেজিতে উত্তর দেয়।

'Catholic Neurosis' বলে একটা টার্ম ব্যবহার করেছেন এই বইতে। পড়ে মনে হয়েছে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে বা বিপরীত এটি। ঠিক এই কারণেই কি আপনি প্রিস্ট হতে পারেননি?

ক্রিশচিয়ানিটির মতে এই ব্যাপারটা দোষের। মানুষের প্রবৃত্তির অন্যতম সেক্স। মেয়েদের দিকে তাকানো বা তাদের নিয়ে ভাবা এগুলো করা মানেই পাপ। আর আমি যখন লিংকন কলেজে ভর্তি হই বুঝতে পারি যে এতোটা কঠোরতা আমার সইবে না।

আপনি বলেছেন যে আমাদের এখন মোবাইল সমাজ। নিচু জাতীর লোকেরা এখন অনেক সহজেই ওপরে উঠতে পারছে। তবে একটা ক্লাস কনসাসনেস চলে এসেছে। আপনার কি মনে হয় না যে ভারতবর্ষ একটা বিদেশি অবয়বে নিজেকে তৈরি করেছে?

হ্যাঁ, ঠিকই তাই। একটা ঔপনিবেশিক ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স আছে এই দেশে। এর ফলে ঔপনিবেশিক চিন্তাধারা এখানে প্রবাহমান। ধরুন যেমন ভাষা। যে দেশের নিজস্ব এতগুলো ভাষা সেখানে ইংরেজি ভাষা lingua franca, হয়ত এতে সুবিধা আছে কিন্তু নিজের দেশের ভাষার তো ক্ষতি হয়। শুধু ভাষা কেন প্রায় সমস্ত বিষয়েই পাশ্চাত্য দেশের কাঠামোর ওপর এদেশের ভরসা। এই যে বললেন ক্লাস কনসাসনেসের কথা এটাও একটা বিদেশি ফেনেমেনন। কাস্ট কথাটা ভারতবর্ষের, ক্লাস নয়। মূল জায়গাটা হল সামাজিক বিভাজন। আমার মনে হয় এই যে মুষ্টিময় কয়েকজনের হাতে যে সম্পদের যাবতীয় মালিকানা সেটাকে দূর করা উচিত।

ভারত এখন উন্নয়নের পথে। কিন্তু কোরাপশনের কাঁটা পায়ে পায়ে জড়ানো। এভাবে কি সত্যি উন্নয়ন হবে?

ভারতবর্ষের সব চাইতে বড় সমস্যা দুর্নীতি। প্রত্যেকটা স্তরে দুর্নীতি জড়িয়ে আছে। রাস্তাঘাট প্রচুর তৈরি হচ্ছে, শিল্পায়নও হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু দুর্নীতি যেখানে সবচেয়ে বড় সমস্যা সেখানে এগুলো কি সত্যি উন্নয়ন এনে দেবে?

'Death of Religion'-এর মানে কী?

রিলিজিয়ান বা ধর্ম এখন অনেকের কাছে অপ্রাসঙ্গিক, অযৌক্তিক। মনুষ্যজ্ঞানের অতীত এমন কিছু আছে যা মানুষের অধীত জ্ঞানের চেয়ে বহুগুণে বড়। ঠিক এমন সব প্রশ্নেরই উত্তর দেয় ধর্ম। তবে এটা অনেকে মানেন না।

বহুত্ববাদ (pluralism), যুক্তিবাদ (rationality), বস্তুবাদ (materialism)—এদের যোগ সূত্র আছে কোনও?

আমার জীবনটা প্রথমে একদিকেই চলেছে। ছোটবেলায় ন্যানির শাসন আর তারপরে ছিল থিয়োলজিক্যাল কলেজ। ক্রিশচিয়ানিটির সঙ্গেই আমার একমাত্র পরিচয় ছিল। ভাবতাম মোক্ষ বোধহয় একমাত্র ক্রিশচিয়ানিটির মধ্য দিয়েই লাভ করা যেতে পারে। তারপর যখন ভারতবর্ষে এলাম, হিন্দু ধর্মের সঙ্গে পরিচয় হল, দেখলাম এখানেও একই কথা। প্লুরালিজম-এ বিশ্বাস করতে শুরু করলাম। বুঝলাম যে সব ধর্মই ভগবানের কাছে পৌঁছে দেয়। এখন যুক্তিবাদের যুগ। ধর্ম যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় না। মানুষ এখন বড্ড বেশি বস্তুকেন্দ্রিক। অলীক কোনও কিছুতে বিশ্বাস করতে চায় না। আর ঠিক এই কারণেই হয়তো স্পিরিচুয়ালিটির জায়গা নেই। আমি বলছি না মানুষ সবকিছু ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যাক। তবে একটা ব্যালেন্সের প্রয়োজন আছে।

আপনার কি মনে হয় না যে বেশিদিন ব্যালেন্স রাখলে it evens out?

আমি মনে করি ব্যালেন্স থাকলে জীবনের ওঠা পড়াকে সমানভাবে হ্যানডেল করা যায়।

এত বছর ভারতে আছেন। কী খেতে সবচেয়ে ভাল লাগে?

ভাল লাগে অনেক কিছু তবে কলকাতাতে এলে ইলিশ খেতে ইচ্ছে করে।

কোন অভিনেতাকে ভাল লাগে?

আমজাদ খান আর অমরেশ পুরি। হেসে বললেন—আমার খুব শখ ছিল অমরেশ পুরির সঙ্গে অভিনয় করার। অভিনয়ের ব্যাপারটা সফল না হলেও উনি আমার এই ইচ্ছা শুনে একবার ফোন করেছিলেন আমাকে। ফোনে ওনার হ্যালো শোনার পর আমার যা বুক ধরফরানি হয়েছিল তা আর বলবার নয়।

আচ্ছা আপনার কি মনে হয় না মার্ক টুলি যেমন প্রত্যেকটা ঘরে জায়গা করে নিয়েছিল এখনকার কোনও করেসপনডেন্ট তেমন ঘরোয়া নয়?

উম...আসলে এর দুটো কারণ আছে। আমি যতদিন ধরে এখানে আছি এখন ততদিন ধরে কেউ থাকে না। দ্বিতীয়ত টেলিভিশন এবং প্রিন্ট মিডিয়া এখন অনেক এগিয়ে গেছে।

পথের পাঁচালি

গাছের ডাল থাকলে, পাখি জিরোতে আসবেই, গেরস্তের ঘর থাকলে, অতিথিও আসবে দুদণ্ড জিরোতে। হোক সামান্য ভাত ডাল, তবু সবার জন্য অন্ন মাপা, কেউ না খেয়ে ফিরবে না এই ভুবনগ্রামে। গেরস্তর কানে সে কথাই যে বলে যায় ইস্টিকুটুম পক্ষী।
জয়া মিত্র

এক গেরস্তের ছিল বেশ এক ভরভরন্ত সংসার। গোয়ালে গরু, পুকুরে মাছ, খেতে বাগানে ফল ফুল শাকসবজি। লোকজন আত্মীয় অনাত্মীয় আওতিজন যাওতিজনে ঘর উঠোন গমগম। কুটুম অতিথি তো লেগেই আছে। মুশকিল হল অতিথি তো অ-তিথি, তাদের আসবার দিনক্ষণ খবরপালা কিছুই থাকে না। তাতে অবশ্য গেরস্তের অসুবিধে কিছু নেই। সংসার থাকলে সেখানে অতিথি আসবে, এটা তো ধরো একটা নিয়ম, গাছের ডাল থাকলে যেমন পাখি এসে দু-দণ্ড জিরোতে বসবেই। বাড়ির সকলের খাওয়া দাওয়া চুকে যাওয়ার পর বাড়ির দুই লক্ষ্মী বউ যখন ভাত নিয়ে বসত, প্রায়দিন তখনই দুই একজন অতিথি এসে পড়ত। বউরা আসন ফেলে তাড়াতাড়ি উঠে তাদের পা-ধোওয়ার জল দিত গামছা দিত তারপর আসন পেতে জলছড়া দিয়ে নিজেদের ভাতটি তাদের সামনে ধরে দিত। দুপুরবেলা ঘরে মানুষ এলে তাকে তো ভাত জল দিতেই হবে। বউরা দু'জনে দু'ঘটি জল খেয়ে আবার বিকেলের পাটে লেগে পড়ত। গেরস্ত গেরস্তানি কিন্তু কোনওদিন শুটিয়ে দেখত না যে বউরা খেয়েছে কী না। সবাই খেয়েছে, বউরাও খেয়েছে নিশ্চয়ই।

এখন, একদিন দু'দিন না হয় অতিথিসজ্জনকে থালার ভাত ধরে দিয়ে তাদের আশীর্বাদ মাথায় করে জল খেয়ে উঠে পড়া যায়, তা বলে মাসের মধ্যে অর্ধেকদিন কী আর সে ভাল লাগে! বাড়ির কেউও কোনওদিন একটা কথা শুধোয় না। একদিন মনের দুঃখে করেছে কী, দুই বউ ভাতের হাঁড়ি দুটি মাথায় নিয়ে খিড়কি পুকুরে গিয়ে ডুব দিয়েছে। দিয়েছে তো দিয়েইছে, আর তারা ওঠে না। মনে দুঃখ নিয়ে ডুব দিয়েছে তো, দুটি পাখি হয়ে গেল তারা। হলুদবর্ণ গায়ের রং কুচকুচে কালো চুলগুলি কালো পালক হয়ে এখানে ওখানে ছড়ানো। ভাতের হাঁড়ি মাথায় ছিল বলে মাথা দুটি কালো। সর্বদা দু'জনে একসঙ্গে থাকে। গেরস্ত ঘরে কুটুম আসবার হলে দুটিতে তাড়াতাড়ি গিয়ে সে বাড়ির বউকে খবর দিয়ে আসে 'ইস্টি—কুটুম ই—স্টিকুটুম' বলে। তাই তাদের নাম হল ইস্টিকুটুম পাখি।

এই গল্পটা সে শুনেছিল তার ঠাকুমার কাছ থেকে। এইরকম টুকরোটুকরো কত গল্প যে তাদের আশপাশের জিনিসপত্রের সঙ্গে মিশে থাকত! সব জিনিসেরই তো একদিন শুরু হয়েছিল! সেই শুরু হওয়ার গল্প শুনতে ভারি ভাল লাগত। অনেকদিন আগে নাকি ক্ষেতে একেবারে ভাতই জন্মাত। গাছে গাছে গোছা ভরা ভরা ভাত। মানুষদের তখন আর কষ্ট করে ধান কেটে ঝেড়ে কুটে খোসা ছাড়িয়ে হাঁড়িতে করে রাঁধতে হত না। খিদে পেলে কেবল পরিষ্কার থালাটি এনে গাছ থেকে ভাত পেড়ে খেলেই হত। তখন কিনা মাঠলক্ষ্মী বলে দিয়েছিলেন যার যতটুকু দরকার সে ততোটুকুই নেবে, ভাত নষ্ট করবে না। কিন্তু একটা দুষ্টুলোক তার ভাইয়ের সঙ্গে হিংসে করে ভাইয়ের ক্ষেতের ভাতগুলি সব নিয়ে এসে মাটিতে পুঁতে দিতে লাগল একদিন করল, দু'দিন করল, তিনদিনের দিন মাঠলক্ষ্মী খেত থেকে সমস্ত ভাত হরণ করলেন। তারপর থেকেই শুরু হল ধান জন্মান।

এই গল্পটি শেষ করেই দিদু বলতেন তাই ভাতের একটি দানাও নষ্ট করতি নাই। যেই কটা ভাত নষ্ট করবা, পরে তোমার সেই কয়টি ভাত কম পড়বে।

তা বলে সব গল্প কি আর দিদু বলে দিতেন? সে

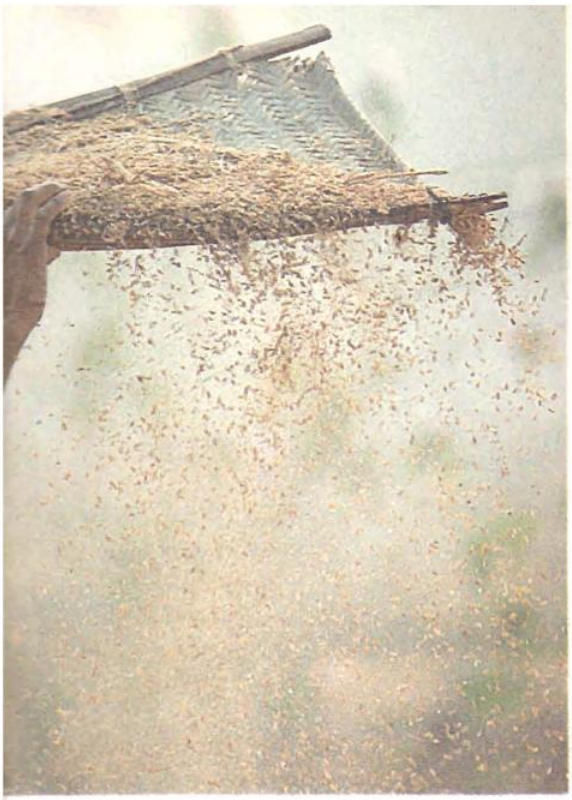

নিজেও অনেক গল্প জোগাড় করত। সেইসব গল্প জোগাড় করার একটা জায়গা ছিল। দোতলায় রান্নাঘর থেকে বাক্সের ঘরের মাঝখানে যে ঢাকা বারান্দা, যেখানে খাওয়া হয়, তার একধারে একটু উঁচু সিমেন্টের বেদীর ওপর পাশাপাশি দুটি জলের কলসি বসান। সেই কলসিদুটোর পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে মাকে দেখত। দুটো কলসির গলার খাঁজে তার মুখটা ঠিক বসে যায়। সকালে খুব দুপুরে কিংবা একটু ঝাপসা সন্ধ্যেয় ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে দেখা যায় মা ব্যস্ত হয়ে আসা যাওয়া করছে। খেতে দিচ্ছে। কাকা পিসিরা স্কুল কলেজে যাওয়ার আগে খেতে বসে। বোন তখন নিজে খাওয়া শিখছে, দুপুরবেলা তারা পাশাপাশি খেতে বসত, বোন ভাবে সেও নিজে নিজে খেতে পারে। তারপর যখন উঠে দাঁড়ায় সারা গা থেকে ঝরঝর করে ভাত পড়ল চারপাশে আর কে যেন বলে উঠল, ঠিক যেন ভাতের গাছ। সে নিজে খুব আস্তে আস্তে খায়। অনেকক্ষণ সময় লাগে তার খাওয়া শেষ হতে। বড় পিসিমা যখন বেড়াতে আসেন, বলেন, 'লক্ষ্মীন্দর জীয়াতে বসিছে।' কথাটা তার মনে খচখচ করত যতোদিন না সে বেহুলার লক্ষীন্দর জীয়ানোর উপাখ্যান পড়ল। কতদিন কতকাল ধরে নদী আর গাঙের জলে ভেসে ভেসে যাওয়া। মৃতকে জীবনে ফিরিয়ে আনবার জন্য মৃত্যুলোকের দিকে সেই যাত্রা যেখানে অমরতা বাস করেন। আরো একটি মেয়ে, সুমেধা সীমন্তিনী, গিয়েছিল সেও মৃতকে ফিরিয়ে আনতে জীবনে। স্বয়ং যমের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে সপ্তপদক্ষেপেরও বেশি গিয়েছিল সে। তার যাওয়া অরণ্যজালের মধ্যে দিয়ে, মাটির উপরে হাঁটা। সাবিত্রী কি সেইজন্যেই বেহুলার চেয়ে কম আপন রয়ে গেল বাংলার কাছে?

ওই কলসির পেছন থেকে জোগাড় করা আর একটি গল্পও রংছাপ সদ্ধ ছবি হয়ে রয়ে গেল বহুদিন।

একজনকেই সে সারা জীবনে জেঠিমা বলে ডেকেছে, যদিও তাঁর স্বামীর কোনও স্পষ্ট ছবি নেই তার নিজস্ব সংগ্রহশালায়। দুপুরবেলা রান্নাঘরের সামনে আসনে বসা জেঠিমা। ভিজে চুল শাদা শাড়ির পিঠে ছড়ান। সামনে ভাতের থালাটি। তার মা বসে আছে উবু হয়ে। জেঠিমা খাচ্ছেন না। তারপর থালার পাশে পাশে লাল মেঝের ওপর কয়েকটা জলের ফোঁটা। মা জেঠিমার হাত ধরে খুব আস্তে আস্তে কিছু বলছে। হঠাৎ সে বুঝতে পারে ওই জলের ফোঁটাগুলোর মানে। বড়দের কাউকে সে তো কোনওদিন কাঁদতে দেখেনি তার আগে। তার যেন কী একরকম ভয় হয়। যেন কী একটা সে দেখে ফেলেছে যা তার দেখবার কথা নয়। অনেক অনেক পরে একদিন সে জানবে সেই জলের ফোঁটা কটির গল্প। জানবে নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার থেকে কয়েক মাইল পথ পায়ে হেঁটে বাড়িতে প্রায় অভুক্ত ছেলেমেয়েদের কাছে যাওয়ার মাঝখানে তাদের দোতলার বারান্দাটির কথা।

মায়ের কাছেই সে শুনবে তাদের ধনহীন সামান্য গৃহস্থ পরিবারেও ঠাকুমার বরাবরের নির্দেশের কথা—দুপুরবেলা যে মানুষ বাড়িতে আসবে সে ভাত না খেয়ে যাবে না। ডালভাত খাবে, কিন্তু খেয়ে যাবে। হয়তো এটা তাদের বাড়ির খুব কিছু অসাধারণত্বও নয়, এমনই হত। হাঁড়ির মাপ সবসময়ে গৃহস্থের খুব ধরাবাঁধা হিসেবে চলত না, কুলিয়ে তো যেত। ইস্টিকুটুম পাখিদের কেউ দূরছাই-ও তো করত না!

ওই খাওয়ার বারান্দাই আবার বিকেলে পড়ারও বারান্দা। দিদু খুব গল্পের বই পড়তেন। পা মেলে, কোলে ধরা বইয়ের দিকে একটু ঝুঁকে একমনে বই পড়তে থাকা ভঙ্গিটাই তার স্মৃতি দিদুর সবচেয়ে পরিচিত ভঙ্গি। বারান্দার সামনের দিকে বসে দিদু বই পড়ছেন, তারই আশপাশে কোথাও বসে মা তাকে পড়াচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়বার কথা মনে আছে সবচেয়ে বেশি। হয়তো সেটা কোনও পুরনো উঁচু ক্লাসের বই। মানে বিশেষ কিছু বোঝা যায় না কিন্তু 'প্রবীণ তুমি প্রবলবীর মাড়োয়াপতি মহারাজ'-এর ঝমঝম তাকে প্রবল মুগ্ধ করে। আরও কিছুকিছু লাইন। তাছাড়া মাকে পুরোটা বলে শোনাতে পারার আনন্দ। সবগুলো শব্দের মানে বোঝা যায় না সত্যি, তবু দুটো একটা তিনটে তো বোঝা যায়। সেগুলোকে ধরে ধরেই সে নিজের মনে মনে কিছু ছবি তৈরি করে নিতে পারে। কিন্তু সংখ্যা! সেগুলোর যে একেবারে কোনওই মানে নেই! দুইয়ের সঙ্গে দুই যোগ করলে চার হল। তার সঙ্গে আরও দুই দিলে ছয়। তারপর? তার যে আর অন্য কিছু হয়ে ওঠার নেই, একেবারে ধরা বাঁধা। মা নিজের কাজে উঠে গেলেও তার কবিতা পড়তে ভাল লাগে। অক্ষর বসিয়ে বসিয়ে শব্দ তৈরি করতেও ভাল লাগে, কিন্তু মা স্লেটে অঙ্ক লিখতে শুরু করা মাত্র সে কাঁদতে আরম্ভ করে। হায়, পরে যে মিহির চক্রবর্তীর মতো আঙ্কিকের সঙ্গে তার এমন ভাল বন্ধুত্ব হবে, সেটা কি আগে হতে পারল না! সেই ছোটবেলায়! তাহলে হয়তো সংখ্যার রহস্যও দেখতে পেত। পৃথিবীর কত বড় একটা দরজা, যা কিনা তার একেবারে আশপাশেই খোলা, সেই ভিতরবাগের রং গন্ধ এবারের মতো না-জানাই রয়ে গেল।

ছবি : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আয় মন বেড়াতে যাবি

সুব্রত মুখোপাধ্যায়

দশ

ভজহরির খোঁটা দেওয়া কথায় প্রসাদের অস্বস্তি হয়। কাঞ্চনপল্লির যে গরিব মানুষ-জোড়া মাথায় ঝাঁকা বয়ে মায়ের ভোগের তৈজস নিয়ে এসেছিল মুখুজ্যে জমিদারের তরফ হতে তারা প্রসাদ পেয়ে উদগার তুলতে তুলতে চলে গেল। আর এক একটি উদগার প্রসাদকে মনে করিয়ে দিল বিষয় আশয় থাকা সত্ত্বেও কি উড়ুনচণ্ডে হাভাতে সংসারের হাল হকিকত। দিনে দিনে ছেলেপুলেদিগের উদর বড়ো হচ্ছে, সংসারে এসো জন বসো জন তো লেগেই আছে। এ অবস্থায় যদি সদাই বেভুল স্বভাব হয় তাহলে আর সংসার করা কেন। বিনি অপরাধে প্রায় কয়েদবন্ধ আত্মজনাদের সাজা দেওয়া।

বেলা মধ্যাহ্নপারে, যখন বেশ ক-পাত্তর ঘটে গেছে রামপ্রসাদের, বলতে গেলে হঠাৎ করেই সংসার চেতনা মনে এল। এই মনে হওয়ার আশপাশটি দুপুর গড়ানে নামা এবং বিচিত্র লতাগুল্ম ঝাঁজগন্ধি, বুনো তেলাকুচো, আর ভাট বনে বাতাস হাঁটকানো বাস, তেলাকুচো আর কুঁচ ফলেদের শরীরে বাতাসের খত্তাল, বকুল ফুলের ঝুরঝুর ঝরণ, মস্ত মস্ত কেয়া ঝোপে গন্ধগোকুলের উলুক শুলুকের মাথায় টুপটাপ পাকা খেজুর পাত, ডাঁটো আকন্দ ঝোপে দুপুর চরা শৃগালের সন্দেহবাই, খেজুরপাতার দোলায় উপবিষ্ট চন্ননা-টিয়াদের ক্যাটর ক্যাটর গল্পগাছা, কালো ময়নার শিসবাহারের সমে ফাঁকে মস্ত মানকচু পাতাদের আয়েশি হেলদোল। এমনতর নিত্যিকার অবস্থায় আজকের এই সংসার চেতনার মুখে পড়ে প্রসাদ বিজড়িত গলা তুলে ডাকলেন, ভজহরি—ওরে ভজহরি, একবার ইদিকে আয় না বাপ।

ভজহরি নিকটেই ছিল। একটি শিশু তালগাছতলে দুপুরের খোয়ারি ভাঙছিল। যেহেতু আজ এখানে প্রসাদ পাওয়া হয়েছে এবং ভোজন দিব্য হয়েছে, তাই তেলাকুচোর ঝোল আর পুঁই মেটুলির হুতাশ মনে নেই।

—কি হল রে ভজহরি। বলি ঘুমিয়ে গেলি কি?

ঝোপ ঝাড় সরিয়ে ভজহরির ফোলা মুখ আর রক্ত চোখ উঁকি দেয়।—হুঁ, হুজুরে হাজির আছি।

—বলিহারি, তুইও দেখছি যবন ভাষা কপচাচ্ছিস। বলি হল কি তোর।

—দিবানিশি তোমার সঙ্গ করে করে এমন হাল।

প্রসাদ ডান হাতখানি সামনে তুলে বলে ওঠেন, একবার যাদিকিনি। আমার তক্তাপোশের নিচে একখানা হাতবাক্সো আছে। ঝট্ করে যেয়ে নে আয় সেখানা।

ভজহরি যথারীতি—এই বলে আর আসবো- বলে ঝোপের আবডালে সেঁধিয়ে পড়ে। প্রসাদ মনে মনে হিসেব কষেণ, রাজা কেষ্টচন্দর, তারপরে গিয়ে তোমার দুর্গাচরণ মিত্তির—। হুঁ, শুধু নামই মনে আছে। জমির পরিমাণ, দাগ-খতেন কিছু মনে নেই। এমনকি মৌজার নামও বেভুল হয়ে গেছে।

খানিক পরে একটি মাঝারি আকারের কাঠ বাক্স বগলদাবা করে ভজহরি ফিরে এল। বাক্সটি বুঝি তিনপুরুষের। পিতলের আঙটা আঁটা। ডালার বুকে চিত্তির বিচিত্তির নকশা আঁকা। ফুল, লতাপাতার ঝালর কাটা। বাক্সের উপরে দেবনাগরিতে খোদাই করা, ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

যেন কতকাল পরে এই প্রাচীন বাক্সটি খোলা হচ্ছে এমনতর প্রসাদী ভঙ্গী হলেও আদপে তা সত্য নয়। যখনই কোনও দান-দলিলপত্র এসেছে এই বাক্সের গর্ভে সেঁধিয়েছে। সে কাজ অবশ্যই সর্বজনীর হাত বরাবর। প্রসাদের হাত এর গায়ে বড় একটা পড়েনি

প্রসাদ হেঁট হয়ে বলেন, খোল, বাস্কোটা খোল্।

ভজহরি বাক্সের ডালা খুলে মেলে ধরে। অমনি ভিতর হতে কয়েকটি তেলাপোকা শুঁড় ফরফরিয়ে সড়াৎ সর বেরিয়ে এল। তারা বক্ষপুরীর এলাকা ছেড়ে বাহিরের এই ঝোপ-জাঙালে দ্রুত হারিয়ে যায়

প্রথমেই বার হয় যে দলিলটি সেটি চোখের সুমুখে তুলে ধরেন রামপ্রসাদ। তুলট কাগজে চোখ পেতে মনে হয় কি অপরিচিত ওই লিখন কোনওদিন কি দেখা হয়েছে, না জীবনে এই প্রথম!

নং ১৮৩৪৮
শ্রীশ্রীরাম
শরণং
পারশী ১৫৮৩
ইঙ্গরাজী
(১৫৮৮) [illegible]

শ্রীরামপ্রসাদ সেন সুচরিতেষু শুভাসীঃ প্রয়োজনঞ্চ বিশেষঃ এ অধিকারে তোমার ভূমিভাগ কিছু নাহি অতএব বেওয়ারিষ গরজমা জঙ্গল ভূমি সমেত পতিত পরগণে হাবেলীসহর ১৬ ষোল বিঘা এবং পরগণে উখড়ায় ৩৫ পয়ত্রিশ বিঘা একুনে একান্ন বিঘা তোমাকে মহোত্তরাণ দিলাম নিজ জোত করিয়া ভোগ করহ ইতি সন (অস্পষ্ট) তারিখ ৪ঠা ফাল্গুন শহর—

রামপ্রসাদ নদীয়াধীপ দস্তখতি কাগজখানি নেড়ে দেখেন।

চমৎকার হস্তাক্ষর এই দলিল লেখকের। তেমনই খাসা মহারাজার সংস্কৃত পাকমারা স্বাক্ষর। ডাইনে বাঁয়ে রাজার সীলমোহর কপচানো।

কিন্তু কোথায় ষোল বিঘা আর কোনখানেই বা উখড়া গ্রামের একান্ন! মাঝে মধ্যে ভাগীদাররূপী কিছু ধর্মপ্রাণ মানুষ ধানপত্র ভাগ দিলেও সে সবই অকুলান। অতঃপর আরও একখানি দলিল, তায়দাদ নং ১৮৩৫০

দর্পনারায়ণ রায়, শ্রীরাম রায় ও কালীচরণ রায় মহাশয়গণ একযোগে ১৭ চৈত্র ১১৬০ সনে ৮% বিঘা জমির সনন্দ—

পলাসি ২% হাবিলিসহর পরগনা
তেতুল্যা ২% হাবিলিসহর পরগনা
বালিয়া ১% হাবিলিসহর পরগনা
কাটা পুখরিয়া ১% হাবিলিসহর পরগনা
ডাসি ২% হাবিলিসহর পরগনা

দ্বিতীয় কাগজখানি দেখার পর প্রসাদ সেটি নামিয়ে রাখেন বাক্সের ভিতরে। হায়, কালীঠাকুরানীর করুণায় এই যাবতীয় কাগজলিখন এখন নেহাৎই কথার কথা। কোথায় দাগ নং খতিয়ান নং-এর নিবাস, কোনখানে জমির আইল, জমাবন্দী, লাখেরাজ ইত্যাকার হিসাবনিকাশ। সবকিছুই যে এখন একাঙ্গী হয়ে জগাখিচুড়িবৎ সাব্যস্ত হয়েছে। কার জমি জিরেত, কে কাকে দেয়, কে তার ফসল রোপন করে, কর্ষণ করে। কিছুকাল আগে রচনা করা একখানি গীতের তুচ্ছ এক অংশ মনে মনে রপটানি খায়, 'ইজারার পাট্টা পেয়ে, এত কি গৌরব বেড়েছে, ওরে স্বয়ং থাকতে কুশের পুতুল, কে কোথা দাহন করেছে...।'

গীতের এই দাহন করা সমাচারের পিছু পিছু নিঝুম বনভূমিতে ব্যস্ত পায়ের শব্দ ওঠে। রামপ্রসাদ দলিল-দস্তাবেজ, খতেন-দাখিলা স্তূপ হতে মুখ তুলে তাকান। তাকায় ভজহরিও। কে জানে, কে এল মধ্যাহ্ন প্রহরে, এত ব্যস্ত সমস্ত পায়ে।

রহস্য বেশিক্ষণ বহাল থাকে না। খানিক পরেই আকাট এই জঙ্গল গড়ের গাছ পালার ফাঁক দিয়ে যে মানুষ মূর্তিটি প্রকাশিত হয় সে প্রসাদ আর ভজহরি দুজনারই চেনা। শীর্ণকায় তাল ঢ্যাঙা এই মধ্যবয়সী মানুষটির খালি গা। মালকোঁচা আঁটা ময়লাধুতি। গলায় লাল সুতো বাঁধা প্রকাণ্ড তাবিজ। উশকো কাঁচা-পাকা মাথা আর মুখময় অচ্ছেদ্য কপচানো দাড়ি-গোঁফ।

প্রসাদ তাকে দেখামাত্র বলে ওঠেন, এসো এসো গজানন, ঠিক সময়েই তুমি এলে।

কতক হাঁফাতে হাঁফাতে গজানন বলে, বেশি কথা বলার সময় নেই বাপ। যা করার এখনি করো।

প্রসাদ মুহূর্তে স্থির হয়ে যান। সুচারু দাড়ির আবডালে তাঁর চোয়াল কঠিন হয়ে যায়। দাঁত দিয়ে উপর ঠোঁট বরাবর পেষণ যন্ত্র নামে। নিঃশ্বাস পাত কিঞ্চিৎ বদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি শুধু বলেন, তাহলে খপর আছে কোনও?

গজানন ঝটিতি বলে, খবর আছে বৈকি। তা না হলে এমন করে দোড় দিয়ে আসি!

—বলে গজানন। খপর বলো।

—হুঁ, সেই চাঁড়াল বেক্তির নাম গণেশ। জলে ডুবে মরেছে, বিস্তর মদ খেয়ে নাইতে নেমেছিল বলে। বয়েস বেশি নয়, পঁচিশ তিরিশ।

—চমৎকার। তাহলে এবার বলো—শরীরে কুঠ রোগটোগ নেই তো?

—একদম পয়পরিস্কার। একটা ফুসকুড়ি অবদি নেই শরীরে।

—বেশ। তাহলে শরীরটি এখন কোথায় আছে শুনি?

—আজ্ঞে যথাযথ স্থলেই আছে। মরেছে আজ দুকুরের খানিক আগে। অপঘাত—তারপর কি সব নেশাপঘাত বলে টলে ওদের কুলপুরুত বিধেন দিয়েছে, বড়তির বিলের ধারে পুঁতে দাও। তাই দেওয়া হয়েছে আজ্ঞে।

প্রসাদ একবার ভজহরির দিকে কটাক্ষ করেন। ভজহরি সঙ্গে সঙ্গে মাথা কাৎ করে মিচকি গম্ভীর হাসে।

প্রসাদ বলে ওঠেন, তাহলে আর বিলম্বে কাজ কি ভজহরি।

ভজহরি দীর্ঘ সায় দেয়, ঠিক কথা, ঠিক কথা।

প্রসাদ নিচু স্বরে উচ্চারণ করেন, বড়তির বিল। অর্থাৎ বারিতির বিল। জোয়ার ভাটি হয়। গঙ্গার সঙ্গে যোগ আছে।

সঙ্গে সঙ্গে ভজহরি জানান দেয়, এখন হাঁটতে আরম্ভ করলে বড়জোর ঘণ্টাটাক লাগবে। যাকগে, আমি থালে তোমার ওই কারবারের জিনিসপত্তরগুলো জলদি করে গুছিয়ে নিই।

গজানন বলে ওঠে, কাল হল গে মঙ্গলবার। সেই সঙ্গে ভরা আমাবস্যে। আর আপনার বায়না মোতাবেক ওখেনে একটি বেলগাছও আছে।

—আর কি আছে শুনি?

—কেন, নিঝুম জলাশয়। জনমানুষ নেই এমন তেপান্তর।

—বটে।

—বেশী বিলম্ব করবেন না আজ্ঞে। মড়াটা এখনও টাটকা আছে।

ভজহরি কটাক্ষ, রাখে, টাটকা।

গজানন গর্জে ওঠে, টাটকা বলে টাটকা। একেবারে সদ্য জালে তোলা মস্ত কালবোস মৎস একখানি।

আমাদের এই তিনতলা বাড়িটির মাথায় সন্ধে ঘনাচ্ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষী ঘুরছে আকাশময়, প্রকাণ্ড সব গাছপালা ঘিরে। তিনতলার ছাদের সানসেটে এইমাত্র এক জোড়া ভুতুম পেঁচা-পেঁচানি এসে বসল। জানান দিল, হুম হুম, হুম হুম। বঙ্কিম চাটুজ্যের শ্বশুর সম্পত্তির প্রকাণ্ড বাগানে সাবেক ভুতো বোম্বাই গাছখানি এমনিতে কালো, সর্বাঙ্গে লম্বা লম্বা শুঁড়ওয়ালা পরগাছা সমেত এখন আরও খরতর কালোর দিকে যাচ্ছে। বাড়ির ভেতরে ভাঁড়ার ঘরে শাঁখে ফুঁ দিচ্ছেন লম্বা লম্বা টেনে টেনে আমাদের প্রপিতামহী বড়মা। এই শত ছুঁই ছুঁই বয়েসেও কি দম। ওদিককার ঘরে রেডিওয় সন্ধেবেলার রম্যগীতি বাজছে। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের পরিচালনায় গান হচ্ছে, রোদে রাঙা ইটের পাঁজা, তার উপরে বসল রাজা, ঠোঙাভরা বাদাম ভাজা, খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না...

ভেতরকার লম্বা বারান্দা বয়ে এসেছে আমাদের বাইরের ঘর হয়ে। ও ঘরের বাইরে একটি রোয়াক, দুধারে সিঁড়ি। পেছিয়ে এসে সদর দরজা। তার ওপারে প্রকাণ্ড খোলা রোয়াক। উঠোন, বাগান, ইঁদারা। ভেতর বারান্দা পেরিয়ে ডান হাতে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি। ঠিক সেই ওঠার মুখে বাঁ হাতে জালের দরজা সাঁটা চোরকুঠুরি, ভেতরপানে লম্বা সেঁধিয়ে গেছে। রাতের বেলা তো কথা নেই, দিনমানেও বিকট কালো ঘুরঘুট্টি। লাইট জ্বেলে ঢুকতে হয়। ওখানে স্তূপ করা থাকে আমাদের বাগানের নারকোল পাতা চেঁছে বার করা ঝাঁটার কাঠির আন্ডিল। থাকে গোরুদের খাবার ভুষি, খোল, ডাল ভাঙা, পাতলা গুড়ের টিন। পাকা কলা কাঁদির বোঝা। বস্তা বোঝাই সুপুরি। কাতার দড়ি, বাগান সামগ্রী-কোদাল, খুরপি, নিড়েনি, শাবল, হেঁসো, নানা আকৃতির দা, ঘাস ছাঁটা কাঁচি। ইঁদারায় পড়ে যাওয়া বালতি, গেলাস ইত্যাদি ওপরে তুলে আনার ইকড়িমিকড়ি কাঁটা। চুবড়ির থাক। সন্দেহ করা, এ ঘরের কোনও কোণে চৌধুরীদের তিন নম্বর সোনার ইঁটখানা পোঁতা আছে। খুঁজলে এখনো পাওয়া যেতে পারে।

কালো রঙা চওড়া আর লম্বা সিঁড়ির ধাপ উঠে গেছে ওপরে। সিঁড়ির বুকে খোপ খোপ নকশা কাটা। ডান হাতে

দোতলার দরজা। তারপরেই একতলার সঙ্গে মিল রেখে মস্ত দালান। দখিন দিকে প্রকাণ্ড চেহারার দরজাসম সার সার জানলা। বাইরের দিকে খড়খড়ি আঁটা দু-প্রস্থ কবাট, ভেতর বাগে পুরু সার্সি আঁটা আর একজোড়া পাল্লা। কবাট যাতে উড়ুক্কু বাতাসে না আছড়ানি খায় সে জন্যে জানলার পাটার গায়ে কাঠের ব্যাঙ বা ফিরকি সাঁটা। বারান্দার গায়ে বাঁ হাতে বাবা-মার শয়ন মন্দির। আর তারই গায়ে বারান্দার দিকে মুখ করা ঠাকুর্দা আর বড়মার ঘর। দুখানি ঘরই বৃহৎ। দৈত্যসম জানলাধারী আর আলো হাওয়াময়। তবে বারান্দার কড়ি-বরগার ফাঁক-ফোকরে গোলা পায়রাদের সংসার গেরস্থালি।

তিনতলার সিঁড়ির আধখানা উঠে একটি বাঁক। ঠিক ওইখানে রাস্তার দিকের দেয়ালে একেবারে বর্তুলাকার বিচিত্র জানলা। তার গায়ে আধখানা চাঁদ আকৃতির দু-পাল্লায় নকসাধারী দু-টুকরো জানলা তার গায়ে সবুজ রঙ। এপারে কালো বর্ণ দুটি পা রাখার পা-দান। পাশে ছোট বালতিতে জল, মগ। রাতে ভিতে দোতলার মানুষজন ওখানে প্রস্রাব সারে।

সিঁড়ি গিয়ে ঘা দিয়েছে তিনতলার ঘরে। দরজা খুললে ছোট-খাটো ঘর। ভেতরে ঢুকে ওই ঘরের দেয়াল খাবলে—একটু উঁচুতে আর একখানি লম্বাটে গুহা ঘর। তিন তিনটি নিচু নিচু আর ছোট ছোট জানলা। একটি দরজা-ছাদমুখো। এ ঘরের নিচে একটি গুপ্ত কুঠুরি আছে। মেঝের সঙ্গে সমান একটি চৌকাণা বিচিত্র ডালা। তার সঙ্গে লাগানো একজোড়া লোহার বালা। ডালার ওজন মস্ত। বালা ধরে টেনে তুললে রহস্য খালাস হয়ে যায়। নিচে প্রকাণ্ড ছ-কোণা গহ্বর কিংবা ঘর। ওপরের মেঝে থেকে নিচেকার দূরত্ব প্রায় এক মানুষ। মেঝের দু-ধারে হাত ভর করে নেমে পড়তে হয়। লোকশ্রুতি, এই ঘরস্য ঘরে রায়চৌধুরী জমিদারদের ধন

দৌলত থাকত। থাকত হীরে জহরত। আমাদের দু-দুটো বাগানের কলার কাঁদি খানিক পুষ্ট অবস্থায় বাবা এই গুম ঘরের পেটে নামিয়ে দেয়। একরাতেই সব কলা পেকে হলুদ। এত কলা যে কলা খাই, কলা মাখি, কলায় শুই এমত অবস্থা।

ছাদের দরজা খুললেই সেই পদ্যটির মতো, আনখ সমুদ্দুর। এত বৃহৎ বাড়ির মাথায় যাকে বলে ঠিক বাড়ি সই ছাদ। মাঝখানে বেশ খানিক তফাতে ছাদের ওপর ভেদ রেখা টানার কায়দায় আড়াআড়ি লম্বা আর দিব্যি চওড়া একটি বাঁধানো থাক। তার ওপর একটি টিনের বড় ভাঙে মাটি ঢেলে ফণীমনসা গাছ। এটি নাকি বাড়িকে বজ্রপাত হতে রক্ষে করে। ছাদের আলসের যেদিকেই দাঁড়াও না কেন চোখ জুড়িয়ে যাবে। আম, জাম, সবেদা, জামরুল, নারকোল, তাল, খেজুর ইত্যাকার বাগানের মাথায় মাথায় হাওয়া খিলখিল। দেদার বাতাসের হুহু খেলা। মস্ত মস্ত বাড়িদের নিঝুম নিরীক্ষণ করা। অনেক ওপর থেকে দেখা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানুষ হেঁটে, সাইকেলে। ক্বচিৎ রিকশার পঁক পঁক। ছাতা মাথায় নিপাট বৃদ্ধ। ঝাঁকা কাঁধে টানা বাসনওয়ালার ঠন্ ঠনাত্ কাঁসর। বিহারি কেক-বিস্কুট বিক্রেতার ফোকলা মুখো হাঁক, কেকআলা-ম্-ম্। আমরা শুনি কি খাইলাম-ম্-ম্। অথবা নিঝঝুম দুপুরে—কুলফি মালাই-ই-ই। হঠাৎ হঠাৎ এক বিহারি মোটা থলথলে বৃদ্ধের ভাঙাচোরা তৈজসপত্র, খবরের কাগজাদি খরিদের বিচিত্র সুরে ছড়া কাটা, ভাঙা পিতল ভাঙা, কাচকড়ুয়া ভাঙা, বই হো বই—। বুড়োর পেছনে ছেলেপুলেরা লাগলে সে ধুতি তুলে অস্থান দেখায়।

হিসেব না করলেও প্রমাণ হয় বঙ্কিমবাবুর গোলাপি রঙা দোতলা শ্বশুর বাড়িটি আমাদের বাড়ির থেকে উচ্চতায় কম হলেও আড়ায় একইরকম। আর ও দিকটায় যেন গাছ গাছালের রাজত্ব ঠাসা। যাকে বলে সবুজঘন জঙ্গলগড়। ও বাড়ির মালিক ক্ষিতীশদাদু। হাতে সবসময়েই ফোঁকা কল। মানে হাঁপানির ইনহেলার। ভারী সুপুরুষ এই বৃদ্ধ। চওড়া ছাতি, বৃষস্কন্ধ আর গৌরবর্ণ। গলায় পৈতে পাক দিয়ে পরলেও ঠাকুর দেবতা মানেন না। একদা রেলে চাকরি করতেন। এখন সারাদিন এক টঙধারী চেয়ারে বসে বিকটশব্দী মারফি রেডিওয় সেন্টার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সারা পৃথিবীর সংবাদ শোনেন—হরেক ভাষায়। মাঝে মধ্যে উচ্চাঙ্গ সংগীত। নিয়মিত 'আনন্দবাজার' আর 'বেতার জগৎ' রাখেন। আর পাড়ার রিফুউজি কলোনির গরিব মানুষদের ছেঁড়া জামাকাপড় পা দিয়ে চালানো উষা মেশিনে সেলাই করে দেন। দুপুরে পিঁড়িতে বসে ভাত খান মস্ত থালায়। চারদিকে গণ্ডা গণ্ডা বেড়াল চোখ মটকায়। দাদুর ভাত খাওয়া দেখার মতো। কানা উঁচু থালায় ভাতের সঙ্গে রুটি ছিঁড়ে দেন। এবার তাতে ভাতের মাড়, দুধ, ডাল, তরকারী, মাছ, অম্বল, পাকা আম, কলা সব একত্রে চটকে মটকে হাপুস হুপুস মুখে তোলেন আর থেকে থেকে ফোঁকা কল টানেন। মাঝে মাঝেই বেড়ালদের ওই মণ্ড না পিণ্ড ছুঁড়ে দেন।

বঙ্কিম ডেপুটির কন্যা শরৎকুমারী দেব্যার কাছ হতে এ বাড়ি কেনেন দাদু। তারও আগে একখানি দলিল আছে। তার টুকরো অংশ, '...এক্ষণে কোনও তীর্থস্থানে বাস করিবার আমার নিতান্ত মানস হইয়াছে। তুমি আমার পরম উপকার করিয়াছ...সৎকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ। অতএব উপরোক্ত সমুদয় সম্পত্তি জমি জেরাত বাগ বাগিচা বাস্তু পুস্কর্ণি ইত্যাদি স্বামী মহাশয়ের স্বর্গার্থে তোমাকে দান করিয়া লিখিয়া দিতেছি...।'

দলিল লেখা হচ্ছে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে। দানপত্র করে দিচ্ছেন বঙ্কিম শাশুড়ি নৃত্যকালী দেব্যা।

ছবি শান্তনু দে

(চলবে)

কলকাতায় নবকুমার

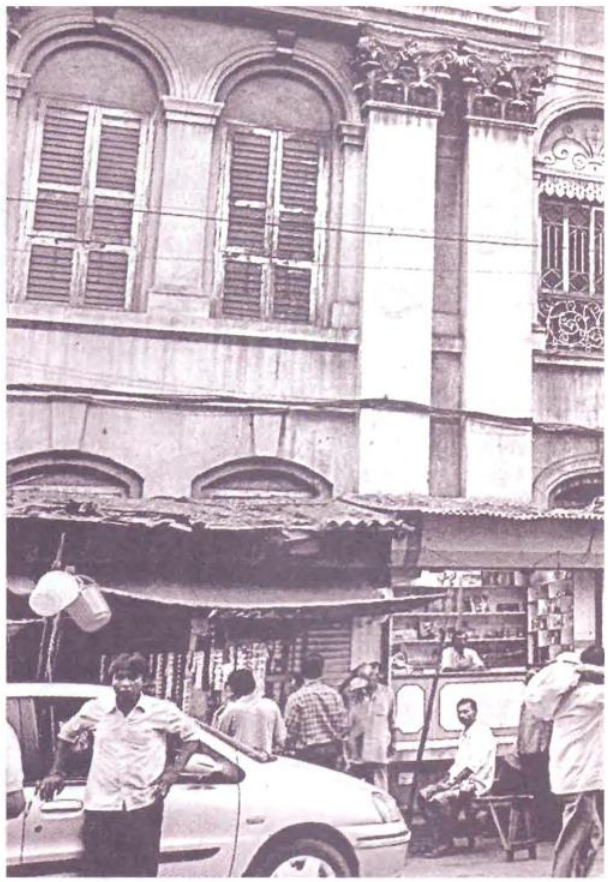

সমরেশ মজুমদার

নবকুমারের মুখে ব্যান্ডেড দেখে মাস্টারদা জিজ্ঞাসা করে কী হয়েছে তার। নবকুমার বলে সে ট্রাম থেকে পড়ে গিয়েছিল। বড়বাবুর সঙ্গে কী কথা হয়েছে জিজ্ঞেস করাতে কথা এড়িয়ে যায় সে। তাতে মাস্টারদা রেগে যায়। বড়বাবু শেফালি মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। নবকুমারকে একটা প্যাকেট দেন তাকে দেওয়ার জন্য। ট্যাক্সিতে নবকুমারের জন্য অপেক্ষা করছিলেন নিরুপমাদি। নবকুমারকে বেরতে দেখেই হাত নেড়ে ডাকেন।

উনত্রিশ

ছুটন্ত ট্যাক্সিতে বসা নিরুপমাদির চুল বাতাসে উড়ছে। সেদিকে তাকিয়ে নবকুমারের খারাপ লাগছে। তাকে আজ আবার মিথ্যে কথা বলতে হবে। সে বাইরে তাকাল।

ফুটপাতে রান্না করছে কয়েকজন শীর্ণ চেহারার মহিলা, পাশে অর্দ্ধনগ্ন শিশু, ঝুপড়ি। তাদের কারণে ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়েছিল। দেখতে দেখতে নবকুমারের খুব খারাপ লাগছিল। এরা কারা? এরা কি কলকাতার মানুষ নয়? ঝড় জল যখন হয় তখন এরা কোথায় যায়? তাদের গ্রামের অধিকাংশ মানুষ গরিব কিন্তু কেউ খোলা আকাশের নিচে এভাবে রেঁধে খায় না থাকে না।

সে নিরুপমাদিকে জিজ্ঞাসা করল, 'এরা কারা?'

নিরুপমাদি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কারা? ও। মেয়েরা বাড়িবাড়ি বাসন মেজে রোজগার করে, ছেলেরা কেউ দিনমজুর, কেউ রিক্সা চালায় আর বেশির ভাগই বউ-এর পয়সায় খায়।'

'এদের বাড়িঘর নেই?'

'নাঃ।' হাসলেন নিরুপমাদি, 'ওরা ফুটে থাকে বলে ভেবো না খুব খারাপ আছে। অনেক নিম্নবিত্ত মানুষের চেয়ে ওদের আয় কম নয়।'

'সরকার কিছু বলে না? মন্ত্রীরা তো এই রাস্তা দিয়ে নিশ্চয়ই যান।'

'যায়। চোখ বন্ধ করে রাখে যাওয়ার সময়। তুমিও চোখ বন্ধ রাখ।' নিরুপমাদি শব্দ করে হাসলেন।

গদি থেকে নিরুপমাদির বাড়িতে পৌঁছতে বেশি সময় লাগে না। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে একটা তিনতলা বাড়িতে ঢুকলেন নিরুপমাদি। বাইরে অন্ধকার নেমে

গিয়েছে। কিন্তু এই বাড়ির সিঁড়িতে আলো নেই।

নিরুপমাদি সামনে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'কোনও ভয় নেই। আমাকে ফলো করো।' তিনতলার ছাদের দরজার তালা খুলে নিরুপমাদি বললেন, 'দ্যাখো, আকাশ দ্যাখো।'

নবকুমার ছাদে পা ফেলে ওপরে তাকাল। ঘোলাটে আকাশ। কয়েকটা তারা সেই আকাশে ছড়িয়ে। কিন্তু দৃশ্যটা মোটেই আকর্ষণীয় নয়। এর চেয়ে তাদের গ্রামের আকাশ ঢের বেশি সুন্দর।

ছাদের একপাশে পরপর তিনটে ঘর। তার একটার দরজা খুলে আলো জ্বেলে নিরুপমাদি বললেন, 'এসো ভাই। বসো।'

'এটা আপনার বাড়ি?' নবকুমার একটা বেতের চেয়ারে বসল।

'দূর। এই বাড়িটার সব তলায় ভাড়াটে ভর্তি। আমি ছাদের ওপর এই তিনটে ঘর নিয়ে থাকি। ওপরে বলে বেশ নিরাপদে আছি।

'আপনি একাই থাকেন?'

'না গো। আমার এক ছেলে আছে। কলেজে পড়ে। সে আজ গেছে তারকেশ্বরে, মামার বাড়িতে। আমার মা ওখানে ছেলের কাছে থাকেন, ওঁকে নিয়ে আসতে। এখন বলো, কী খাবে? চা কফি না অন্য কিছু। না বললে কিন্তু খুব রাগ করব।'

'আপনি এত পরিশ্রম করে এসে চা বানাবেন?'

'ওম্মা। চা বানাতে কষ্ট হয় নাকি? তাছাড়া কোনও কোনও কাজ ছেলেদের কাছে খুব কষ্টের মনে হলেও মেয়েরা আনন্দ পায়।'

নিরুপমাদির কথা শেষ হতেই বাইরে কারও গলা শোনা গেল জড়িয়ে জড়িয়ে কিছু বলছে। নিরুপমাদির মুখ শক্ত হল। বললেন, 'তুমি একটু বসো, আমি আসছি।'

নিরুপমাদি ছাদে পা রাখতেই নবকুমার শুনতে পেল, 'এই যে, ঘরে কে? কাকে নিয়ে এসেছ? আমি নেই, কিন্তু ছেলে তো আছে, সে কোথায়?'

'তুমি আবার মদ খেয়ে এই বাড়িতে এসেছ?' নিরুপমাদি চাপা গলায় বললেন।

'এক্কেবারে হাত খালি। জীবনের শেষ মদটা আজ খেয়ে ফেলেছি। আর কোনও মদ এখন থেকে গলায় নামবে না। বিশ্বাস করো। তা বাবুটি কে? যাত্রার?'

'তুমি এখান থেকে চলে যাও!'

'কেন? আরে লজ্জা পাচ্ছ কেন? এতদিন এখানে সেখানে লুকিয়ে চুরিয়ে ফস্টিনস্টি করতে, এখন সোজা ঘরে তুলে এনেছ। তার মানে সাহস বেড়েছে। দাও না, শ'খানেক হলেই হবে। চেয়ে এনে দাও।'

'তুমি একটি ইতর। ঘরে যে বসে আছে সে আমার ছেলের সমবয়সী। তাকে নোংরা কথা শুনতে দিতে আমি রাজি নই। যাও, বিদায় হও। এক্ষুনি।'

'যাঃ। ছেলের বয়সী? কী গুল মারছ? কই দেখি।' জোরে জোরে পা ফেলে ঘরে ঢুকে পড়ল লোকটা। তারপর একটা বেতের চেয়ারে শব্দ করে বসে পড়ল। নোংরা পাজামা-পাঞ্জাবি, মুখে পানের দাগ, লোকটা নবকুমারকে ভাল করে দেখে বলল, 'ও। তাই তো। তা বাবাজীবন, কী করা হয়?'

'প্রম্পট করি।'

'বুঝলাম। ওই সূত্রে আলাপ। তুমি তো নিরুপমার ছেলের বয়সী। তাই তো? আমি নিরুপমার ছেলের বাবা। তাহলে তুমিও আমার ছেলের বয়সী। কি, ঠিক বললাম

পুরো নাটকটায় আমি বড়জোর পনেরো ষোলো মিনিট স্টেজে থাকব। তুমি তোমার বুক পকেটে একটা সেল ফোন রাখবে। যখনই আমার সংলাপ আসবে তখনই ফোন অন করে কথা বলবে। আমি আমার বুকের মধ্যে আর একটা সেল ফোন রাখব। কর্ডলেশ রিসিভার কানে গুঁজে রাখলে কেউ বাইরে থেকে দেখতে পাবে না

তো? আমার না মাইরি, সম্পর্কগুলো কিরকম গুলিয়ে যায়।'

নিরুপমাদি বললেন, 'এবার তোমাকে যেতে হবে।'

'যেতে তো হবেই। অমর কে কোথা কবে? বুঝলে হে প্রম্পটার। এই যে আমাকে দেখছ, দেহপট সনে নট সকলি হারায়, আমার অবস্থা এখন তাই। কিন্তু তিরিশ বত্রিশ বছর আগে বিজ্ঞাপনে আমার ছবির নিচে লেখা হত, সুদর্শন নায়ক এবং গায়ক। আলাদা গাড়ি, রোজ এক টিন সিগারেট, কোলিয়ারিতে গেলে সবচেয়ে ভাল হোটেলের সেরা ঘর—! সব ব্যবস্থা ছিল আমায় জন্যে। আমার কোনও প্রম্পটারের দরকার হত না। একবার পড়লেই মুখস্থ হয়ে যেত। একেবারে স্বামী বিবেকানন্দের মতো মেমারি ছিল তখন। সব গেল। বিয়ে করে সর্বনাশ হয়ে গেল ভাই। বিয়ে করেছ? করোনি? বেঁচে গেছ। কখনও করো না।' হাত নাড়তে লাগল লোকটা। নিরুপমাদি চলে গেলেন পাশের ঘরে।

'আপনি আর যাত্রায় অভিনয় করেন না?'

'নো। আমি কি ভিখিরি? বাসে পাঁচজনের সঙ্গে যাব, বারোয়ারি খাবার খাব, তিন মিনিটের একটা পার্ট করব?'

'এরকম হল কেন?'

'নেক্সট ডে। আর একদিন বলব। প্রথমদিনেই সব শুনতে চেও না প্রম্পটার। দাও, শ'খানেক হলেই চলে যাবে।' হাত বাড়াল লোকটা।

'কী?'

'একশটা টাকা দাও। ভ্যানতাড়া করো না। শোধ দিয়ে দেব। কথা দিচ্ছি।'

'কিন্তু—।'

'ধ্যাত। নো কিন্তু। এই যে আমার বউ-এর সঙ্গে নির্জনে আড্ডা মারছ তা কি তোমার দলের লোকজন জানে? জানে না? আমি কথা দিচ্ছি জানবে না। দাও।'

'আপনি এসব কী বলছেন? উনি আমার দিদির মতো।'

'মতো? এই ক্যালকাটায় মতো বলে কিছু নেই প্রম্পটার।' হাত নাচাল লোকটা।

দ্রুত ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিরুপমাদি বলল, 'নাও, নিয়ে দূর হও।'

একশোটাকার নোট দেখে হাসি ফুটল লোকটির মুখে। খপ করে সেটা ধরে পকেটে পুরে উঠে দাঁড়াল, 'মাইরি বলছি, তুমি না এখনও ফাইন এ্যাকটিং করতে পার। যাচ্ছি বাবা যাচ্ছি।' দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে লোকটা মাথা ঘোরাল, 'প্রম্পটার। আর একদিন হবে। তোমার যেদিন গল্পটা শুনতে ইচ্ছে করবে, সেদিন।'

লোকটা চলে গেলে নিরুপমাদি চেয়ারে বসে পড়লেন। বাঁ হাতে আঁচল টেনে নিয়ে তাতে মুখ ঢাকলেন। সামান্য ফোঁপানির শব্দ শুনতে পেল নবকুমার। মিনিট দুয়েক পরে আঁচল সরিয়ে চোখ মুছলেন নিরুপমাদি, 'বিশ্বাস করো, ও যে আজ এখানে আসবে আমি ভাবতে পারিনি।'

'উনি কোথায় থাকেন?'

'কাশীপুর না কোথায়, আমি ঠিক জানি না।'

'প্রায়ই টাকার জন্যে আসেন?'

'প্রায়ই। তবে কখনও গদিতে গিয়ে বিরক্ত করে না। আবার বাড়িতে ছেলে আছে জানলে কখনও ওপরে ওঠে না। কী করে যে জানতে পেরে যায়।'

'এরকম হল কেন?'

'অনেক গল্প। আচ্ছা বলো তো, অমৃত কখন বিষ হয়ে যায়?'

বুঝতে পারল না নবকুমার। শ্বাস নিলেন নিরুপমাদি, 'ভালবাসলে। থাক এসব কথা। এতক্ষণ বসে আছ অথচ কিছুই খেতে দিতে পারিনি তোমাকে। আর একটু বসো ভাই।' নিরুপমাদি ভেতরে চলে গেলেন।

কথাটা মাথায় ঢুকে আর বেরুচ্ছিল না নবকুমারের। ভালবাসলে অমৃত বিষ হয়ে যায়? কেন? ভালবাসলে বিষ কি কখনও অমৃত হয়ে উঠে না?

'নাও।'

দুটো সন্দেশ, এক গ্লাস সরবত সামনে রাখলেন নিরুপমাদি।

'আপনি খাবেন না?'

'একবারে রাত্রে খাব।'

সন্দেশ মুখে পুরল নবকুমার। কলিকাতার মিষ্টি গ্রামের থেকে শতগুণে ভাল। চিবুতে চিবুতে পরম তৃপ্তি জাগে।

'তোমাকে যে জন্যে এত কষ্ট দিলাম—!'

'হ্যাঁ বলুন।' সরবতে চুমুক দিল নবকুমার।

'বড়বাবু তো তোমাকে খুব পছন্দ করেন, সবাই বলছিল।'

হাঁ হয়ে গেল নবকুমার। কোনওমতে বলল, 'আমি জানি না।'

'দলের সবাই বলে। সত্যি কথাটা বলবে ভাই? আমাদের ঘরে কি কোনও বড় অভিনেত্রী আসছে যে মায়ের পার্ট করবে?' কাতর চোখে তাকালেন নিরুপমাদি?

সঙ্গে সঙ্গে বড়বাবুর মুখ মনে পড়ল। তিনি নিষেধ করেছেন কাউকে কিছু বলতে। কলিকাতায় বাস করতে হলে মিথ্যে বলতে জানতে হয়। সে মাথা নাড়ল, 'আমি তো কিছু জানি না। সুধাময়বাবু—!'

'না। উনিও জানেন না। মাস্টার কথাটা রটাচ্ছে।' হাসলেন নিরুপমাদি, 'তুমি যখন কিছু জানো না তখন খবরটা সত্যি নয়।'

'মাস্টারদা বলেছেন?'

'ওইভাবে কী বলে! এই যেমন, তোমার বারোটা বেজে গেল। দলে নতুন মা আসছেন। কে তিনি জিজ্ঞাসা করলে চোখ ঘোরায়, কি জানি!'

'নতুন কেউ এলে আপনার বারোটা বাজবে কেন?'

'বা রে! আমি তখন কী চরিত্র করব? আমাকে তো নায়িকা, বউদি এসব চরিত্রে মানাবে না। এখন সব দলে কাস্টিং হয়ে গেছে। এখানকার চাকরি চলে গেলে কোথাও কাজ পাব না। রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে যে।' নিরুপমাদি বললেন, 'তার ওপর তো একটা অজুহাত আছেই।'

'অজুহাত?'

'ওই যে। আমি কানে কম শুনি? আমি নিজে বুঝতে পারি না। সত্যি বলো তো। তোমার কি মনে হয়। কম শুনি?'

'আপনি তো বলেছেন একটু জোরে প্রম্পট করতে।'

'ওই জন্যেই তো তোমাকে ডেকেছি।'

'মানে?'

'তুমি যদি শুধু আমারটা জোরে বল তাহলে অন্যদের বুঝতে হবে না যে আমি কানে কম শুনি। তোমাকে তাই সাহায্য করতে হবে।'

'কী ভাবে?'

'পুরো নাটকটায় আমি বড়জোর পনেরো ষোলো মিনিট স্টেজে থাকব। তুমি তোমার বুক পকেটে একটা সেল ফোন রাখবে। যখনই আমার সংলাপ আসবে তখনই ফোন অন করে কথা বলবে। আমি আমার বুকের মধ্যে আর একটা সেল ফোন রাখব। কর্ডলেশ রিসিভার কানে গুঁজে রাখলে কেউ বাইরে থেকে দেখতে পাবে না। আমার সংলাপগুলো তুমি বললে আমি স্পষ্ট শুনতে পাব। এতে একটু খরচ হবে। তা ধরো পার শো কুড়ি টাকা। কিন্তু কেউ টের পাবে না। এটুকু আমার জন্যে করবে না ভাই?'

'কিন্তু যদি ভুল হয়ে যায়?'

'রিহার্সাল দিয়ে নিলে ভুল হবে না। কিন্তু মনে রেখো, গদিতে রিহার্সাল যখন দেব তখন যেন কেউ টের না পায় ব্যাপারটা।'

হেসে ফেলল নবকুমার, 'ঠিক আছে। এটুকু করতেই পারি। আজ আমি উঠি। অনেক দূরে যেতে হবে।'

'যেতে হবে মানে? আমি তো তোমাকে পৌঁছে দেব বলেছি।'

'না না। তার দরকার নেই।'

'দরকার নেই বললেই হল? তুমি রাস্তা চেনো?'

দরজায় তালা দিয়ে নিরুপমাদি নবকুমারকে নিয়ে একতলায় নামতেই দেখলেন তাঁর ছেলে মাকে নিয়ে বাড়ি ফিরছে। নবকুমারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন তিনি। ছেলে জিজ্ঞাসা করল, 'উনি এরমধ্যে খেয়ে নিয়েছেন?'

'নারে। মিষ্টি ছাড়া কিছু খেল না।'

'তুমি তো ওর জন্যে রান্না করেছিলে—।'

'আর একদিন খাবে। তুই এক কাজ কর, ও রাস্তাঘাট চেনে না। ওকে আমাদের যাত্রার গদি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আয়।'

'বেশ তো। চলুন।'

নিরুপমাদির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কয়েক পা হাঁটার পর নবকুমার বলল, 'আপনি আমাকে একটা ট্রামে তুলে দিন। তাহলেই হবে।

'মা যে বলল—!'

'ট্রামে উঠলে আমার সুবিধে হবে।' যাত্রার গদি ছাড়িয়ে সোনাগাছির গলির মুখে ছেলেটির সঙ্গে নামতে চাইল না নবকুমার।

পরের এপিসোড আগামী রোববার

ছবি তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সে
সেন
সলিউশনস

হাত বাড়ালেই রাইমা। খুচখাচ ঝামেলা, টুকটাক সমাধান। একটু বন্ধুত্ব আর অনেকটা বিশ্বাস। চিন্তা কিসের, আপনার কাছে রাইমা আছে

আমার সমস্যা হল, আমি কিছুতেই একটানা পড়তে পারি না, এমনকী পরীক্ষার সময়ও না। পড়তে বসলে, মাঝে-মাঝেই উঠে টিভি দেখি, না হলে নিউজপেপার বা ম্যাগাজিন পড়ি। এরজন্য যে পড়াশোনার ক্ষতি হয়, তা নয়। কিন্তু বাবা-মা আমাকে নিয়ে খুবই চিন্তিত। ভয় পাচ্ছেন, যদি আমার রেজাল্ট খারাপ হয়!

—রিমি সেন, শ্যামবাজার

পড়ার সময় যদি মাঝে মাঝে ছোট ছোট ব্রেক নাও তাহলে সেটা খারাপ কিছু নয়। এতে পড়ায় একঘেয়েমি আসে না। কিন্তু এই ব্রেক বেশিক্ষণ ধরে চলতে থাকলেই তো মুশকিল! যখন পড়তে ইচ্ছা করবে না, তখন নোটস তৈরি করো। দেখবে, কিছুক্ষণ পর পড়ায় মন চলে আসবে। কোনও পড়া যদি কঠিন মনে হয়, তা হলে সহজ বা জানা পড়া দিয়ে শুরু করো। পড়ার মাঝে অল্প কিছুক্ষণের জন্য টিভি দেখতেই পারো। কিন্তু গল্পের বইগুলো হাতের কাছে না রাখাই ভাল। মেডিটেশনের অভ্যাস করে দেখতে পারো। তাহলে কনসেনট্রেশন বাড়বে।

আমি এই বছর উচ্চমাধ্যমিক দেওয়ার পর ভাল রেজাল্টের জন্য কলকাতার নামী কলেজে ভর্তি হয়েছি। কিন্তু নতুন কলেজে আমার মানিয়ে চলতে খুব অসুবিধা হচ্ছে। আমি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। আমার লাইফস্টাইল অত্যন্ত সাধারণ। এখানে দেখছি সকলের হাতেই একটা করে অত্যাধুনিক মোবাইল। আমার তো একটা সাধারণ মোবাইল কেনারও সামর্থ্য নেই। সবমিলিয়ে, নিজেকে খুব ছোট লাগছে। কনফিডেন্স

পাচ্ছি না। অচেনা পরিবেশে নিজেকে খুব বোকা-বোকা মনে হচ্ছে। রাইমা দিদি, আমি নিজেকে কীভাবে প্রপার গ্রুম করব, বলে দাও প্লিজ।

—রিনা, বসিরহাট

প্রথমেই তোমাকে বলব, তুমি 'নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে' এই ভাবনাটা মাথা থেকে এক্কেবারে ঝেড়ে ফেলো। নামী কলেজে যখন চান্স পেয়েছ, মন দিয়ে পড়াশোনাটা চালিয়ে যাও। চারপাশে সবাই কী ধরনের সালোয়ার কামিজ পরে সেটা ফলো করো। সেই মতন কিছু ভাল মানানসই সালোয়ার কামিজ বানিয়ে নাও। ওদের মতো দামি দামি পোশাক পরতেই হবে—এমনটা কিন্তু নয়। আর মোবাইলের ব্যাপারে বলি, এটা কাজের জিনিস। শুধুমাত্র স্টেটাস মেনটেন করবার জন্য মোবাইল কেনার কোনও মানে হয় না। তাই ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেকস-এ ভোগারও কোনও প্রয়োজন নেই। ওদের সঙ্গে সহজভাবে মেশার চেষ্টা করো। কনফিডেন্স বাড়াও। হেজিটেশন কাটিয়ে ফ্রেন্ডশিপ করো খোলামনে।

আমার সমস্যা হল, আমার দাঁতে হলদে ছোপ রয়েছে। কীভাবে এর প্রতিকার সম্ভব?

—অলিভিয়া রায়, ভানকুনি

তুমি একটা কাজ করো। এক চিমটে বেকিং পাউডার আঙুলে নিয়ে দাঁতে ঘষবে। কিছুক্ষণ রেখে ধুয়ে ফেলবে। এটা প্রতিদিন করতে পারলে উপকার পাবে। এছাড়া সরষের তেলে নুন মিশিয়ে দিনে একবার দাঁতে ঘষলেও উপকার হবে।

আমার নখ খুব সহজেই ভেঙে যায়। আলাদা করে নখের কী যত্ন নেব, বুঝতে পারছি না। প্লিজ হেল্প।

—দেবপ্রিয়া মুখোপাধ্যায়, গড়িয়া

ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি থাকলে নখ খুব সহজে ভেঙে যায়। খাবারে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বাড়ান। দু'বেলা দুধ খাবেন। এছাড়া উষ্ণ গরম জলে জিলেটিন মিশিয়ে নখে নিয়মিত লাগান। এগুলো ট্রাই আউট করুন, উপকার পাবেন।

আমার বয়স আঠাশ। আমার ঠোঁটের রং ধীরে ধীরে কালো হয়ে যাচ্ছে। খুব সিগারেট খাই। কী করব?

—স্বপ্নীল সেনগুপ্ত, সিঁথি

আমি পাস গ্র্যাজুয়েট। মুর্শিদাবাদের এক প্রত্যন্ত গ্রামে থাকি। ইচ্ছা আছে, কলকাতায় গিয়ে চাকরি করার। এমনিতে আমি বাকপটু। তাই সেলস ও মার্কেটিং-এ কেরিয়ার তৈরি করতে চাই। আমার এই বিষয়ে সেরকম কোনও ধারণা নেই। এই পেশায় আসতে গেলে কীরকম শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রয়োজন, তা যদি আমাকে জানাও—তাহলে খুব ভাল হয়।

—অমিত সাহা, মুর্শিদাবাদ

সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং-এর পেশায় আসতে গেলে একজ্যাম-এ খুব ফাটাফাটি রেজাল্ট করাটা ডাজ নট ম্যাটার। গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেই এই প্রফেশনে আসা যায়। মানুষের সঙ্গে সহজে মেলামেশা করার ক্ষমতা থাকাটা খুব ইমপরট্যান্ট। সঙ্গে চাই পরিশ্রম করার মেন্টালিটি। অনেক সময় ছুটির দিনেও কাজ করতে হতে পারে। সেইভাবেই নিজেকে তৈরি করতে হবে। সো, তোমার প্লাসপয়েন্ট—বাকপটুতাকে কাজে লাগাও। আর চাকরি খুঁজতে উঠে পড়ে লাগো।

আপনি একটা কাজ করুন। গোলাপ ফুলের ডাঁটি স্প্রিসারিনে ভিজিয়ে রেখে দিন। সারাদিনে কয়েকবার ঠোঁটে লাগান। নিয়মিত ব্যবহার করুন, রেজাল্ট পাবেন।

কিছুদিন হল, আমার স্কিনে হোয়াইটহেড-এর সমস্যা দেখা দিয়েছে। কী করলে এটা সারবে?

—তনিমা চক্রবর্তী, লেকটাউন

তুমি প্রতিদিন সকালে হালকা গরম জলে মধু মিশিয়ে খাও। অয়েল ফ্রি প্রডাক্ট ব্যবহার করতে পারলে ভাল। ফেসওয়াশ দিয়ে দিনে দু'বার মুখ ধোবে। ওটমিল ও দইয়ের একটা প্যাক স্ক্র্যাবার হিসাবে ব্যবহার করতে পারো। এছাড়াও জায়ফল বেটে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে লাগানো যেতে পারে।

এই ঠিকানায় লিখো—সেন সলিউশনস, রোববার, সংবাদ প্রতিদিন ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭২

রা
রান্নাঘরে
রেস্তোরাঁ

বিসিবিলা হুলিয়ানা

যেমন বিসিবিলা, যেমন হুলিয়ানা, তেমনই বাঘা তেঁতুল। দক্ষিণী খিচুড়ির সঙ্গে চিকেন কোরি গাস্যি—রোববার-এর পাতে আজ কথাকলি।
অর্পিতা চৌধুরী

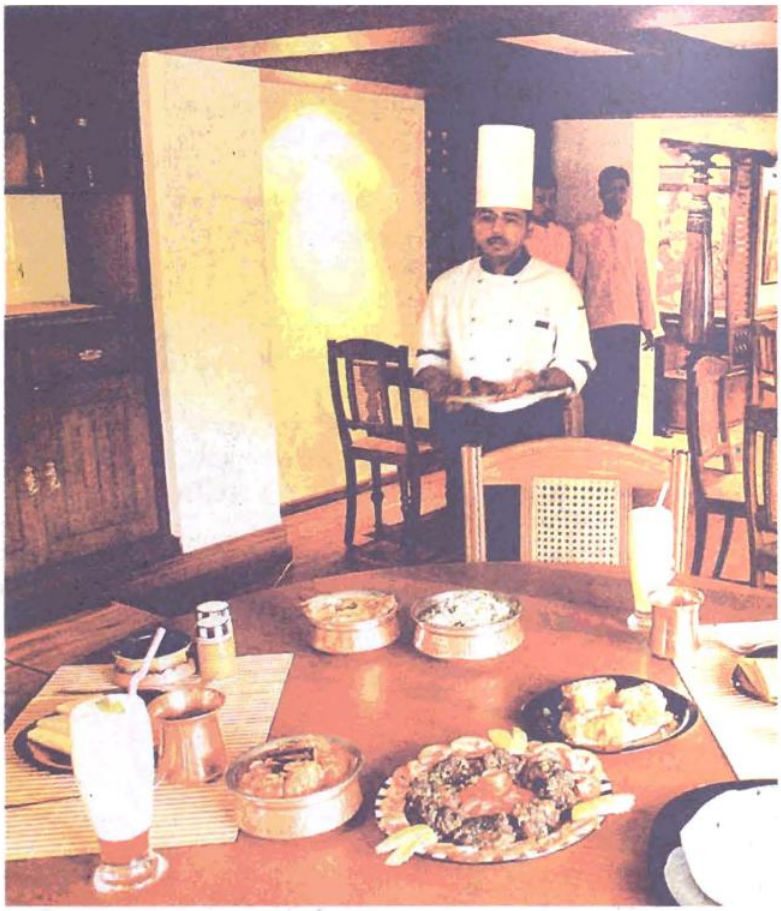

রেস্তোরাঁর নামটা চোখে না পড়লে আর ক্যালেন্ডারের কথা মাথায় না থাকলে মনে হতেই পারে দক্ষিণ কলকাতার কোনও দুর্গাপুজোর মণ্ডপ। যেখানে থিম দক্ষিণ ভারত। রেস্তোরাঁর প্রবেশপথ থেকে টেবিলের ম্যাট্রেস—সর্বত্র দক্ষিণী ছোঁয়া। অপরিসীম মমতা আর দক্ষতার সঙ্গে কলকাতার বুকে তুলে ধরা হয়েছে একটুকরো দক্ষিণ ভারত। শুধু 'ট্যামারিন্ড' নামকরণেই নয়, এই রেস্তোরাঁর পরতে পরতে মিশে আছে দ্রাবিড় সভ্যতার সনাতন ঐতিহ্য।

মোটা মোটা থামের সঙ্গে লাগোয়া চওড়া উঠোন পায়োলা পেরিয়ে ঢুকেই চোখে পড়ে কেরলের হস্তশিল্পের নমুনা—সুসজ্জিত গরুর মুখ। কেরলে ওনাম উৎসবে গরুদের দৌড় প্রতিযোগিতা হয়। তখন নাকি এভাবেই সাজানো হয় প্রতিযোগীদের। রেস্তোরাঁয় খেতে বসে খাবারের সঙ্গে সঙ্গে নজর কেড়ে নেয় অন্দরসজ্জাও। মালয়ালি গেরস্ত বাড়ির বিভূতি রাখার পাত্র এখানে কড়িকাঠ থেকে ঝুলন্ত বাহারি ল্যাম্পশেড।

রেস্তোরাঁর আলো আঁধারির রহস্যময় পরিবেশ অভিনবত্বের দাবিদার। কী নেই সেখানে? দেওয়ালে রবি বর্মার পেইন্টিং-এর পাশে চামড়ার ওপর ভেষজ রঙে আঁকা চর্মচিত্র। চওড়া থামে দেবদেবীর মূর্তি, খেতে বসার জন্য কেরালাইট বেঞ্চ, জলপানের জন্য তামার গ্লাস, টেবিলে বাঁশের কঞ্চির ম্যাট্রেস—খাবারের স্বাদের সঙ্গে সঙ্গে দ্রাবিড়িয়ান মেজাজকে ধরে রাখতে কোনও কসুর করেননি ট্যামারিন্ড কর্তৃপক্ষ। দক্ষিণ ভারতীয় খাবার মানেই ধোসা, ইডলি আর বড়া—বুনো ওলের মতো এই পুরনো ধারণাকে হিমঘরে পাঠিয়েছে শরৎ বোস রোডের বাঘা তেঁতুল। ভেঙে দিয়েছে অন্য একটা মিথ—দক্ষিণ ভারতীয় খাবার মানেই আমিষবর্জিত।

নিরামিষ খাবারকে প্রায় বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তিনবছর আগে যখন এই রেস্তোরাঁ শুরু হয়, অনেকের কপালেই ভাঁজ পড়েছিল। এমনকী, প্রথম কয়েকমাস চিন্তা ছিল রেস্তোরাঁর মালিকেরও। কিন্তু সব আশঙ্কায় জল ঢেলে দিনে দিনে বাড়তে লাগল ট্যামারিন্ডের কদর। আরও ভাল করে ডালপালা মেলতে শেষ পর্যন্ত ঠিকানা বদল করল তেঁতুলগাছ। তাকে তুলে নিয়ে দেশপ্রিয় পার্কের কাছে নতুন পাড়ায় সদ্য পোঁতা হয়েছে। চলছে শেষ মুহূর্তের অঙ্গসজ্জার কাজ। কয়েকদিনের মধ্যে পর্দা ওঠার পালা।

কিন্তু হঠাৎ বাঙালির কাছে দক্ষিণী রান্নার পালাবদল ঘটানোর কারণ কী? রেস্তোরাঁর সহ-মালিক গৌতম পুরকায়স্থ জানালেন বেশ কিছু বছর আগে দক্ষিণ ভারত বেড়াতে গিয়েছিলেন তিনি আর তাঁর দাদা সিদ্ধার্থবাবু। সেখানে গিয়ে রাস্তার ধারে ঝুপড়ি থেকে অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ি—সব জায়গায় স্থানীয় রান্না খেয়েছেন তাঁরা। এবং সব জায়গাতেই খাওয়ার পরে আঙুল চেটেছেন। তখনই দু'জনে ঠিক করেন কলকাতায় ফিরে এই অজানা অচেনা দক্ষিণ ভারতীয় হেঁসেলকে সবার সামনে তুলে ধরতেই হবে। বেড়াতে গিয়ে স্থানীয় পরিবেশে ওই খাবার খেয়েই ওঁরা দক্ষিণ ভারতীয় রান্নার খুঁটিনাটিগুলো বুঝতে পারেন।

তেলেঙ্গানা আর হায়দ্রাবাদি রান্নার প্রভাবে অন্ধ্রপ্রদেশের রান্নায় চূড়ান্ত ঝাল দেওয়া হয়। ওখানে খাওয়ার সময় অতিথিকে তোয়ালে দেওয়ার নিয়ম প্রচলিত। কারণ খেতে

বলে অনেক সময় তিনি চোখের জলে নাকের জলে ভেসে যান আর তেলেঙ্গানার ছোঁয়া আছে বলেই অন্ধ্রবাসীদের খবরে দেখা মেলে সামুদ্রিক মাছ আর চিংড়ির। প্রতিবেশী কর্ণাটকের রান্নায় আবার বর্গিদের হানাদারি বেশি।

তামিলনাড়ুর হেঁসেল শাসন করে আইয়ার আর চেট্টিয়ার গোষ্ঠীর রান্না। গোঁড়া দক্ষিণী ব্রাহ্মণ আইয়ারদের পছন্দ হাল্কা এবং নিরামিষ অভিয়াল, সম্বর আর পোরিয়াল। অন্যদিকে চেট্টিয়াররা বণিকশ্রেণি। একসময় বাণিজ্যতরী ভাসিয়ে চলত দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার নানা দেশে। ওইসব দেশের প্রভাবে তাদের আমিষ রান্নায় তেজপাতা, এলাচ, কাঁচা লঙ্কা, জায়ফল, দারচিনি, গোলমরিচ মাস্ট।

এদের সবার থেকে আবার আলাদা কেরল। ভাস্কো-দা-গামা আর কথাকলি নাচের দেশে মুসলিম, খ্রিশ্চান, পর্তুগিজ, ডাচ-নানা হেঁসেলের ছোঁয়ায় পাল্টে গেছে খাবারের রকমসকম। অবধারিতভাবে এসে পড়েছে মাছ আর মাংস।

ট্যামারিন্ড চেষ্টা করেছে এই ঘরানার সবকটিকে তাদের সূক্ষ্ম পার্থক্য আর স্বকীয়তা বজায় রেখে পেশ করতে। তাই মশলা আমদানি করা হয় তামিলনাড়ু আর মশলার স্বর্গরাজ্য কেরল থেকে। কারণ কালপাসি, স্টার আনিস, মারাঠি মুগ—এই বিশেষ বিশেষ মশলা সঠিক অনুপানে না পড়লে রান্নার সেই তারই যে আসবে না। এইভাবে খেয়াল রাখা হয়েছে যাতে স্থানবদলের সঙ্গে সঙ্গে রান্নার গোত্রান্তর না ঘটে যায়।

কিন্তু দ্রাবিড়-কুম্বলের দেশের খাবার দাদার দেশের মানুষের মুখে রোচাতে কিছু পরিবর্তন করতেই হয়েছে। কমাতে হয়েছে নারকোল তেল আর মশলার ব্যবহার। তাতেই কিস্তিমাত। ভেতো বাঙালি হই হই করে খাচ্ছে কুর্গ চিকেন, ফিশ পরিচড্ডু, কোরি গাস্যি আর কোরিয়েন্ডার রাইস। এর আগে এই রেস্তোঁরার মালিকানায় কিছু বদল হয়েছে। সেইসঙ্গে নতুন ঠিকানায় আসার পর আরও একটা পরিবর্তন এসেছে। দক্ষিণ ভারতীয় খাবারের সঙ্গে সঙ্গে ট্যামারিন্ডে এবার থেকে মিলবে তন্দুরি রান্নাও।

বাঙালি রান্নায় আচার অম্বল বানানো আর পুজোর বাসন মাজা ছাড়া তো তেঁতুলের সেভাবে চলই নেই। হেঁসেলে তেঁতুল একেবারে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। তো এই দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকই ইদানীং অনেক কিছু শিখিয়েছে বাঙালিকে। ট্যামারিন্ড না থাকলে আমরা বোধহয় জানতেও পারতাম না আমাদের মতো কেরালাবাসীও চেটেপুটে খিচুড়ি খান। সেই খাবারের নামটা কিন্তু বেশ খটমট—বিসিবিলা হুলিয়ানা। মালয়ালি ভাষায় বিসিবিলা মানে ডাল সবজি মেশানো ভাত। আর হুলিয়ানা মানে মেশানোর কায়দা।

ছোটবেলায় হজপজ (Hodgepodge) বানান মনে রাখার জন্য যতই 'হডজে পডজে' 'হডজে পডজে' আওড়াই না কেন, রান্নাঘরের হজপজ খিচুড়ি নিয়ে আমাদের আদিখ্যেতার শেষ নেই। শরণার্থী শিবির থেকে অষ্টমীপুজোর ভোগ—কোথায় নেই খিচুড়ি! যদি ভাবেন চালে-ডালে বসিয়ে দেওয়া সেই খিচুড়ি খেতে ট্যামারিন্ডে ছুটব কেন, তবেই ভুল করবেন। উপকরণ এবং স্বাদ দু'দিকেই কিন্তু বেশ আলাদা ব্যাক ওয়াটার আর বাইচের দেশের খিচুড়ি। সঙ্গে সাইড ডিশ নিতে পারেন কোরি গাস্যি। ইলিশ মাছ ভাজাকে না হয় একদিন এই চিকেনের

DUTTA FOOD PRODUCTS PVT. LTD. CITY OFFICE : AB 103, SECTOR 1, SALT LAKE, KOLKATA 700064, Ph 2359 4211/2321 9164

প্রিপারেশন দিয়ে রিপ্লেস করলেন!

বাঙালিরা এখনও এই খাবারে সেরকম অভ্যস্ত হতে পারেননি বটে! কিন্তু যারা একবার এক্সপিরিমেন্ট করেছেন, তাদের এক্সপিরিয়েন্স এত ভাল যে তারা বারবার এই বিজাতীয় খিচুড়ি খেতে চান। আর মারোয়াড়ি বা গুজরাতি পরিবারের কাছে তো বাঙালি খিচুড়ির এই ছোটবোন একেবারে হটকেক!

সুকুমার রায় 'খিচুড়ি' ছড়ায় যতই লিখুন না কেন, 'হাঁস ছিল, সজারু, (ব্যাকরণ মানি না),/হয়ে গেল "হাঁসজারু" কেমনে তা জানি না।' ট্যামারিন্ডে কিন্তু রান্নার ব্যাকরণ ষোলোআনা মেনেই তৈরি করা হয় বিসিবিলা হুলিয়ানা।

'মালগুডি ডেজ'-এর 'অ্যান অ্যাস্ট্রোলজার্স ডে' গল্পে তেঁতুল গাছের তলায় ভাগ্যগণনা করতে বসত এক ভণ্ড জ্যোতিষী। কিন্তু শরৎ বোস রোডের এই তেঁতুলতলায় ঠকবার কোনও প্রশ্নই নেই। কারণ এখানে স্বামিনাথনের দেশের শেফ-এর কড়া নজরদারির নিখুঁত নিক্তিতে মাপা হয় রান্নার কোয়ালিটি কন্ট্রোল। তাই ভোজনরসিকের রসনার বাসনা পূর্ণ হবেই হবে।

এক প্লেট বিসিবিলা হুলিয়ানা করতে **লাগবে**

চাল—৭৫ গ্রাম
অড়হর ডাল—২৫ গ্রাম
সজনে ডাঁটা—৪ টুকরো
ছোট গাজর—১টা
মটর শুঁটি—৫টা
মিষ্টি কুমড়ো—৪টুকরো
গোটা গরম মশলা—৫গ্রাম
তেঁতুল—৫গ্রাম
কারিপাতা—৮টে
হিং—১চিমটে
ছোট পেঁয়াজ—৪টে
শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো—স্বাদমতো
নুন—স্বাদমতো
ঘি—৪টেবিল চামচ
সাদা তেল/নারকোল তেল—২চামচ

সম্বর মশলার জন্য **লাগবে**
টিন্ডাল—৪গ্রাম
ধনে—৪গ্রাম
জিরে—সামান্য
দারচিনি—২টো
মেথি—সামান্য
গোলমরিচ—২চিমটে
শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো—১গ্রাম
হিং—১চিমটে

এবার

প্রথমে সম্বরের সব মশলা একসঙ্গে শুকনো কড়াইতে নাড়াচাড়া করে নিন। এবার এই মিশ্রণ মিক্সিতে পেস্ট করে নিন। মশলার এই পেস্ট আলাদা করে রাখুন।

এরপর ভাত করুন। খেয়াল রাখবেন ভাতটা যেন একটু গলা গলা হয়। তারপর ডাল সিদ্ধ করে নিন। ভাত আর ডাল আলাদা আলাদা রাখুন।

এবার সম্বর বানান। তারজন্য কড়াইতে প্রথমে তেল দিন। তাতে গরম মশলা, মেথি, সরষে, কারিপাতা, শুকনো লঙ্কা দিয়ে ফোড়ন দিন। এবার এর মধ্যে দিন হিং। একটু নাড়ার পরে তাতে সজনে ডাঁটা, গাজর, মটর শুঁটি আর কুমড়ো দিয়ে দিন। তারপর তাতে পেস্ট করা সম্বরের মশলা দিন। এরপর এতে নুন দিন। সবার শেষে এতে সিদ্ধ করা অড়হর ডাল মেশান। নামানোর আগে তেঁতুল দিন। আপনার সম্বর তৈরি। এটাকে আলাদা করে রাখুন।

একটা পাত্রে ঘি গরম করুন। তাতে ছোট ছোট করে কাটা পেঁয়াজ, কারিপাতা, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো, তেঁতুল আর নুন দিয়ে সাঁতলে নিন। এবার এরমধ্যে সম্বর মেশান। কিছুক্ষণ পর এতে ভাত দিয়ে দিন। তিন-চার মিনিট ধরে ভাল করে মিশিয়ে নিন। নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

এক প্লেট কোরি গাস্যি করতে **লাগবে**

বোনলেস চিকেন—১০০ গ্রাম
সাদা তেল/নারকোল তেল—৩ টেবিল চামচ
গোটা ধনে—৫ গ্রাম
গোলমরিচ—২ গ্রাম
গোটা জিরে—২ গ্রাম
দারচিনি—৩-৪ টে
গোটা মেথি—১ গ্রাম
রসুন—৫ গ্রাম
আদা—২ গ্রাম
শুকনো লঙ্কা—২ গ্রাম
নারকোল কোরা—১/৪ মালা
তেঁতুল গোলা—স্বাদমতো
কারিপাতা—কয়েকটা
নুন—স্বাদমতো
টমেটো পিউরি—১ চামচ

এবার

প্রথমে সব মশলা একসঙ্গে পেস্ট করে রাখুন। এবার কড়াইতে তেল গরম করুন। এতে দারচিনি, মেথি, কুচনো রসুন, কারিপাতা দিয়ে ফোড়ন দিন। এরমধ্যে মাংস দিন। কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করার পর নুন, টমেটো পিউরি, পেস্ট করা মশলা মেশান। ভাল করে সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত নাড়তে থাকুন। নামানোর আগে তেঁতুলগোলা জল, ভাজা রসুন, নারকোল কোরা ভাল করে মিশিয়ে দিন। নামিয়ে বিসিবিলা হুলিয়ানার সঙ্গে পরিবেশন করুন।

ছবি : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

Approach Roads & Bridges

Multi-product SEZ's

Several Small & Medium Scale Enterprises

Health, Education & Residential Developments

Over 17 lakh job opportunities

Coming Soon

NKID

A City of New Opportunities

For the growth and transformation of the economic and social landscape of West Bengal,

unitech® Dream. Believe. Create.

USE Universal Success

22, Camac Street, Block-A, 4th Floor, Kolkata - 700 016, India Ph.: +91 33 2289 2000, 6450 2000 Fax: +91 33 2289 1530, +91 98319 53407
E-mail: kolkata@unitechgroup.com www.unitechgroup.com

SHRACHI

নিউ টাউন কলকাতায়
প্রকৃতি আপনার খুব কাছে

খোলা জায়গা, প্রচুর আলো ও সবুজে ঘেরা একটি বাড়ীর কথা ভাবুন। গ্রীণউড **এলিমেন্টস**, নিউ টাউনে ৪র্থ ও আমাদের ৫ম গ্রীণউড প্রোজেক্টে রয়েছে সবুজের ছোঁয়া। চাহিদার তুলনায় আরো বেশী খোলামেলা জায়গায় প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিন। বিখ্যাত স্থপতি অজয় চৌধুরীর ডিজাইনে তৈরী বেঙ্গল শ্রাচি হাউজিং ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের নির্মিত সর্বাধুনিক আবাসনে বিলাসবহুল জীবনকে উপভোগ করুন।

- **নিউ টাউন, অ্যাকসন এরিয়া-II, কলকাতায় সর্বাধুনিক বিলাসবহুল এসি অ্যাপার্টমেন্ট**

সিটি সেন্টার-II থেকে ২ মিনিট, হলদিরাম (ভি আই পি রোড) থেকে ৫ মিনিট ও এয়ারপোর্ট থেকে ১০ মিনিটের দূরত্ব

- ছোটদের ও বড়দের সুইমিং পুল, ইন্ডোর গেমস্ ও চিল্ড্রেন্স কর্নার সমেত অত্যাধুনিক আবাসিক ক্লাব
- মডিউলার কিচেন ও চিমনির সুবিধাযুক্ত অ্যাপার্টমেন্ট

greenwood
elements
Live out of the box

যোগাযোগ করুন, শ্রী নির্মাল্য সেনঃ 9836211143
SMS BS to 8888

Bengal Shrachi Housing Development Ltd. (A Joint Sector Company with West Bengal Housing Board), Shrachi Tower, 686, Anandapur, E.M. Bypass - R.B. Connector Junction, Kolkata-700107, West Bengal. Ph: 033 3984 3984, Fax: 033 3984 4249. Email: marketingbsh@shrachi.com. Visit us at: www.shrachi.com

BSH/046